গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৭ সংখ্যা (ডিজিটাল) www.ganadabi.com ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

গ্রামীণ ভারত বনধ সর্বাত্মক

সংগ্রামী কৃষক ও খেতমজুরদের অভিনন্দন

এস ইউ সি আই (সি)

২৫ সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ভারত বনধকে সর্বাত্মক রূপ দেওয়ার জন্য সংগ্রামী কৃষক এবং খেতমজুরদের অভিনন্দন জানিয়েছেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। ওই দিন এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, সংসদে সংখ্যাধিক্যের জোর খাটিয়ে তিনটি কৃষক বিরোধী বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। এর বিরুদ্ধে সারা দেশের সংগ্রামী কৃষক-খেতমজুররা যে ভাবে রুখে দাঁড়িয়ে গ্রামীণ ভারত বনধকে সর্বাত্মক রূপ দিয়েছেন, তাঁদের অভিনন্দন জানাই। এই কৃষক বিরোধী এবং জনবিরোধী আইনগুলি দেশের কৃষি বাজারকে পুরোপুরি দেশি এবং বিদেশি বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেবে। গরিব চাষি, নিম্ন ও মধ্য চাষি এবং খেতমজুরদের কাছে আমাদের আবেদন, সংগঠিত হয়ে শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলুন। আন্দোলনের তীব্রতা এমন বৃদ্ধি করুন যাতে বিজেপি সরকার এই কালা কানুন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। অন্যান্য অংশের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, সারা দেশ জুড়ে এই আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসুন।

নতুন আইনে চাষিকে একচেটিয়া পুঁজির মুঠোয় এনে দিল বিজেপি সরকার

টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় ২৪ জুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের শিরোনাম— 'ল্যান্ডমার্ক বিলস ফ্রি দি ফার্মার ঃ দি মোদি গভর্নমেন্ট হেরাল্ডিং দি পাথ ফর ফারমার্স টু বি আত্মনির্ভর'। অর্থাৎ মোদি সরকার এমন সব বিল এনেছে যার ফলে দেশের কৃষকরা সব আত্মনির্ভর হয়ে যাবে যেন 'এ দেশেতে নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র যাতনা।' বাজে কথার চাষ বলে ফেলে দিলে চলবে না, ভক্তি করে পড়তে হবে। কারণ মন্ত্রীমশাই অনেক দামি কথা বলেছেন, যা পড়লে এই দুঃখের দিনেও আপনি একটু প্রাণ খুলে হাসতে পারবেন।

কী বলেছেন মন্ত্রীমশাই? বলেছেন এতদিন কৃষকরা ফড়েদের হাতে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছিল, এখন বিজেপি সরকারের এই আইন বলে তাঁরা 'যে দাম চায় সেই দামেই দেশের যে কোনও প্রান্তে তাদের কৃষিপণ্য বিক্রি করতে পারবে।' ইচ্ছামতো দামে দেশের যে কোনও

দুয়ের পাতায় দেখুন

উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়াতে কৃষকদের রাজপথ অবরোধ। ২৫ সেপ্টেম্বর

এই নাকি রাজধানী সাজানোর সময়!

এ সরকার কাদের জন্য?

উদাহরণটা অতি-ব্যবহারে হয়ত ধার হারিয়েছে। কিন্তু এমন অসংবেদনশীলতা, দেশের মানুষের দুর্দশার প্রতি এতখানি নির্মম উদাসীনতার সামনে দাঁড়িয়ে রোমসম্রাট নিরোর সেই অতি প্রচলিত কাহিনি মনে পড়বেই— একদা রোম যখন আগুনে পুড়ছিল, সম্রাট নিরো মনের আনন্দে প্রাসাদের ছাদে বসে বেহালা বাজাচ্ছিলেন।

এমনই ঘটতে দেখা গেল এবার ভারতে। গোটা দেশ যখন অতিমারির আক্রমণে বিধ্বস্ত, ঠিক সেই সময় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মহা উৎসাহে গ্রহণ করল বিপুলায়তন এক পরিকল্পনা, যার নাম 'সেন্ট্রাল ভিস্টা'। কী হবে এতে? নতুন দিল্লির ঠিক মাঝখানে তৈরি হবে ঝকঝকে এক নতুন রাজধানী। সেখানে থাকবে নতুন সংসদ ভবন। তাকে ঘিরে দশটি প্রশাসনিক ভবন। থাকবে প্রধানমন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতির বিলাসবহুল ও বিশালাকার বাসভবন। প্রধানমন্ত্রীর আশা, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে ২০২২ সালে দ্বারোদঘাটন হবে এই নতুন প্রাসাদগুলির। প্রাথমিক ভাবে এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। ওয়াকিবহালরা জানাচ্ছেন, মোট খরচের পরিমাণ ৬০ হাজার কোটিও ছাড়াতে পারে। এখানে বলে রাখা ভাল, এই ভয়ঙ্কর অতিমারি পরিস্থিতি মোকাবিলায় এই সরকারই বরাদ্দ করেছে মাত্র ১৫ হাজার কোটি টাকা!

নতুন সংসদ ভবন গড়ার বরাত ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছে টাটা কোম্পানি। বরাদ্দ হয়েছে ৯২২ কোটি টাকা। ঠিক এই সময়ে দেশের অর্থনীতির চেহারাটা একবার দেখে নেওয়া যাক। গত কয়েক বছর ধরেই বেহাল দশা চলছিল ভারতীয় অর্থনীতির। তার ওপর করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউনের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হয়ে গেছে। বেহাল দশা কর্মসংস্থানেরও। লকডাউনে অসংখ্য সংস্থা, ছোট দোকানপাট, ব্যবসাপত্র বন্ধ হয়ে কাজ গিয়েছে বহু মানুষের। এখন আনলক পর্বে চলছে ব্যাপক ছাঁটাইয়ের পালা। শুধু বেসরকারি ক্ষেত্র নয়, খোদ সরকারি দপ্তরগুলিতেও কর্মীসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিজস্ব নিয়মের গেরোয় পড়ে ধুঁকতে থাকা অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা দিয়েছে করোনা অতিমারি। দু'বেলা দু'মুঠো জোগাড় করতে নাভিশ্বাস উঠছে দেশের অধিকাংশ মানুষের। অসুখে পড়লে সরকারি হাসপাতালে বেড নেই, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য নেই। করোনা মোকাবিলায় কি কেন্দ্র, কি রাজ্য— কোনও সরকারই এমনকি অস্থায়ী হাসপাতালও তৈরি করেনি।

এই যখন অবস্থা, ঠিক তখনই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার হাতে

তিনের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় সরকারের বেসরকারীকরণ ও শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে AIUTUC'র ডাকে

১ - ৭ অক্টোবর'২০

সারা ভারত প্রতিবাদ সপ্তাহ

১ অক্টোবর - রেল, প্রতিরক্ষা সহ সরকারীক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
২ অক্টোবর - অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে
৩ অক্টোবর - স্কীম ওয়ার্কারদের সমস্যা সমাধানের দাবিতে
৪ অক্টোবর - পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের দাবিতে
৫ অক্টোবর - ব্যাঙ্ক সহ অর্থনৈতিক সংস্থায় বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে
৬ অক্টোবর - বিদ্যুৎ, কয়লা, স্টীল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে
৭ অক্টোবর - শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ৪টি শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে

AIUTUC

চাষি একচেটিয়া পুঁজির মুঠোয়

একের পাতার পর

প্রান্তে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে পারবে? দেশের মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষকরা? যাদের ঘরে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, রোগ হলে চিকিৎসা নেই, শিক্ষা যাদের কাছে আকাশের চাঁদের মতো অধরা, যারা চাষ করে মহাজনের কাছ থেকে উচ্চ সুদে টাকা ধার করে, যাদের ফসল মাঠে থাকতেই বিক্রি করে দিতে হয়— এই রকম কৃষক তো দেশের মোট কৃষকের ৮৬ শতাংশ। এই ধরনের কৃষকরা ফসলের অভাবি বিক্রি না করে, বস্তাবন্দি করে, পরিবহনের বিপুল ব্যয় বহন করে, দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নিয়ে গিয়ে ইচ্ছামতো দামে বিক্রি করতে পারবে বলে কি অমিত বাবু সত্যিই বিশ্বাস করেন? আমি জানি তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁকে আর যাই হোক নির্বোধ বলা যায় না। তিনি ভাল করেই জানেন, এ অসম্ভব। তবে কেন এই মিথ্যাচার? কেন এই অনৃতভাষণ?

আসলে মিথ্যা না বলে ওঁদের কোনও উপায় নেই। এত কুকর্ম ওঁরা করছেন যা ঢাকতে ওদের নিত্য নতুন মিথ্যা উদ্ভাবন করতে হচ্ছে। কিন্তু তা করতে গিয়ে ওরা খেই হারিয়ে ফেলেছেন। না হলে না খেতে পাওয়া কৃষকরা দেশের যে কোনও প্রান্তে গিয়ে ইচ্ছামতো দামে ফসল বিক্রি করতে পারবে— এ কথা বলে কেউ!

আসলে ওঁরা একটা ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম করেছেন। তা হল সরকারি সহায়ক মূল্যে কৃষিজ পণ্যের দাম পাওয়ার যতটুকু ব্যবস্থা এতদিন ছিল আইন করে অমিত শাহজিরা তা তুলে দিয়েছেন। কেমন করে? এপিএমসিকে বাস্তবে অকার্যকর করে দিয়ে। বিষয়টাকে একটু ব্যাখ্যা করে বলা যাক।

এপিএমসি হল সরকারি সহায়ক মূল্যে কৃষকের ফসল বিক্রির ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে। রাজ্যের কৃষি এলাকাকে নানা ভাগে ভাগ করে এক একটা এপিএমসি এলাকা তৈরি হয়। সেই এলাকায় একটা নিয়ন্ত্রিত বাজার বা মান্ডি থাকে। সেখানে গোডাউন থাকে, ফসল মাপার ব্যবস্থা থাকে, খুচরো দোকান থাকে, এজেন্টদের ঘর ইত্যাদি থাকে। এক একটা নিয়ন্ত্রিত বাজার বা মান্ডির অধীনে একশ দেড়শ গ্রাম থাকে। বহুজাতিক পুঁজি বা কোনও ব্যবসাদার এখানে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কৃষিজ দ্রব্য কিনতে পারে না। কিনতে পারে একমাত্র সরকার নিযুক্ত এজেন্টরা। এরা কিছু কমিশন পায়। আর রাজ্য সরকার কৃষকের কাছ থেকে খাজনা নেয়। এখানেও নানা ধরনের দুর্নীতি হয়। এবং তার বিরুদ্ধে কৃষকদের লড়াই করতে হয়। কিন্তু তবুও কৃষকরা এই এপিএমসিতে সরকারি সহায়ক মূল্যে ফসল বিক্রি করার সুযোগ পায়। আইন করে বিজেপি সরকার এই এপিএমসিকে পঙ্গু করে দেওয়ার ও পরিণামে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলল। কিন্তু কীভাবে?

নতুন আইনে এপিএমসি থেকে তার গ্রাম গুলোকেই বাদ দিয়েদেওয়া হয়েছে। এখন এই সব গ্রামে আম্বানি-আদানিরা অবাধে কৃষিপণ্য কিনতে পারবে। প্রথম প্রথম তারা মান্ডি থেকে দু-এক টাকা দাম বেশি দেবে। সরকার ইতিমধ্যে মান্ডিগুলোকে হীনবল করে ফেলবে, ঠিক মতো অর্থবরাদ্দ করবে না, সেখানে ঠিক মতো কেনাবেচা হবে না, শেষপর্যন্ত রুগ্ন হয়ে মান্ডিগুলো এক এক করে বন্ধহতে থাকবে। তখন বহু জাতিক পুঁজির সামনে একেবারে খোলা মাঠ। জলের দরে কৃষকদের ফসল তুলে দিতে হবে ওদের হাতে। এই ভবিতব্য কৃষকদের জন্য অপেক্ষা করছে। চুক্তি চাষ প্রসঙ্গে মন্ত্রী মহোদয় যা বলেছেন তাও কম চমকপ্রদ নয়। তিনি বলেছেন, এই চুক্তি চাষ 'কৃষকের আয় অনেক বৃদ্ধি করবে'। খুব ভালো কথা। কৃষকের যদি আয় বৃদ্ধি হয়, কৃষক যদি সন্তান সন্ততি নিয়ে দুধে ভাতে থাকে তা হলে আমাদের কারও আপত্তির কোনও কারণ নেই। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়কে প্রশ্ন, এই অসাধ্য সাধন হবে কীভাবে? আপনারা যে আইন তৈরি করেছেন তাতে তো এর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। বরং এতে তো কৃষকের সমূহ সর্বনাশ হবে। কেন এ কথা বলছি?

চুক্তি হবে কাদের মধ্যে? এক দিকে থাকবে বৃহৎ বহুজাতিক পুঁজি, অন্য দিকে থাকবে সহায় সম্বলহীন কৃষকরা। চুক্তিতে লেখা থাকবে কোন গুণমানের কতটা পণ্য কী দামে কৃষকের কাছ থেকে কেনা হবে। গুণমান অনুযায়ী দাম। গুণমান ঠিক করবে কে? বৃহৎ বহুজাতিক পুঁজি। তারা কৃষকের স্বার্থে সঠিক গুণমান নির্ণয় করে সঠিক দাম দেবে, এ ভরসা করা যায়? আইনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, কৃষকের কাছ থেকে কৃষিপণ্য নেওয়ার সময় কোম্পানি তিন ভাগের দুই ভাগ দাম দেবে। বাদবাকি দাম দেবে গ্রেডেশনের পর, অর্থাৎ গুনমান ঠিক হয়ে যাওয়ার পর। এখন গ্রেডেশনের পর কোম্পানি যদি বলে তোমার পণ্য গুণমানে কম তাই তুমি বাকি টাকা পাবে না, কী করবে কৃষক?

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। হরি মোড়লের সাথে চুক্তি হল রিলায়েন্স কোম্পানির। প্রতি কুইন্টাল আলু আটশো টাকা দরে সে কিনবে। কিন্তু সেবার আলুর ফলন অনেক বেশি হয়ে যাওয়ায় বাজারে চারশো টাকা দরে আলু পাওয়া যাচ্ছে। কোম্পানি ডবল দাম দিয়ে হরি মোড়লের কাছ থেকে আলু কিনবে? সে চুক্তিমেনে চলবে? সে নিজের লোকসান করে চাষির ঘরে পয়সা ঢুকিয়ে দেবে? দেবে না যে একথা বুঝতে অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। ফসল নিয়ে চাষি তখন কী করবে? চোখের জলে বুক ভাসানো ছাড়া তার আর কোনও উপায় থাকবে না।

বলা যেতে পারে এ আশঙ্কা অমূলক। কোম্পানি এমন কাজ করতেই পারে না। কিন্তু এ আমাদের আশঙ্কা নয়, বাস্তব সত্য। মহারাষ্ট্রের তুলা চাষিদের ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো তো ঠিক এই কাজ করেছে। এ দেশের সবচেয়ে বেশি কৃষক আত্মহত্যা তো এখানে। এবং এটাই তার অন্যতম প্রধান কারণ। এই সরল সত্য কী মন্ত্রীবর অস্বীকার করতে পারেন?

আর দুনিয়ার অভিজ্ঞতা কী? যে সব দেশে আইন করে চুক্তি চাষ চালু হয়েছে সেই সব দেশের গরীব কৃষকদের অবস্থা কী? কী অবস্থা আফ্রিকার ঘানা, মালি, জাইরে, সুদান, ইথিওপিয়া, জাম্বিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার পানামা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস এমনকি ব্রাজিল ইত্যাদি দেশের? ওই সব দেশের গরিব চাষিরা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে শহরে গিয়ে ভিক্ষা করছে। আর সেখানকার বহুজাতিক পুঁজি তার মুনাফার পাহাড় বাড়িয়েছে। এ দেশেও সেই একই ঘটনা ঘটছে ও ঘটবে। অমিত শাহজিদের কি এ কথা অজানা? আসলে ওরা মালিকের পায়ে মাথা বিক্রি করে দিয়েছেন। তাই সত্য স্বীকারের সাহস ওদের নেই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে একটা বিষয়ের উল্লেখ করেননি। হয়ত ভেবেছেন উল্লেখ করা বাহুল্য। কিন্তু তাঁর কাছে বাহুল্য হলেও জনজীবনে তার প্রভাব ভয়াবহ। ওরা চাল, গম, ডাল, সবজি, দুধ, মাছ, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি সব কিছু যে আম্বানি, আদানিদের হাতে তুলে দিয়েছেন তা ঘুনাক্ষরেও উল্লেখ করেননি। এর পরিণতি কী হবে অমিতবাবু? খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়বে হু হু করে, পাল্লা দিয়ে বাড়বে জনগণের অনাহার। বেসরকারি হাতে যাওয়ার পর সবকিছুরই দাম হয়েছে আকাশছোঁয়া— এটাই তো ঘটনা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, সার, বীজ, কীটনাশক— সব কিছুরই তো দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে বাজার অর্থনীতির মালিকদের হাতে যাওয়ার পর। বেড়েছে, কারণ এটাই স্বাভাবিক। এটাই বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। ওরা পণ্য উৎপাদন করে মুনাফার জন্য। জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়। খাদ্য নিয়েও ওরা তাই করবে। মুনাফা করবে। কম দামে কিনবে, আকাশছোঁয়া দামে বিক্রি করবে। প্রয়োজনে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করবে। কৃষক মরবে, গৃহস্থ গরিব মধ্যবিত্ত মরবে। এই প্রক্রিয়া দেশে চলছে, ভাজপা সরকারের নতুন এই নীতির ফলে তা আরও অনেক বেশি বেগবান হবে, জনগণের সর্বনাশ হবে। আর সরকার পালন করবে নীরব দর্শকের ভূমিকা।

তা হলে কোন পথ অবলম্বন করতে হবে— যে পথ অবলম্বন করলে কৃষক বাঁচবে, শহরাঞ্চলের হতদরিদ্র গরিব মধ্যবিত্তরাও বাঁচবে? একটাই মাত্র পথ আছে। তা হল কৃষকের ফসল সরকার কিনবে লাভজনক দাম দিয়ে, আর সরকারি ব্যবস্থায় জনগণের কাছে কম দামে বিক্রি করতে হবে। খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করতে দেওয়া চলবে না। অর্থাৎ চালু করতে হবে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা এবার কুযুক্তি তুলে বলবেন, সরকারের হাতে অর্থ কোথায়? আমরা বলি অর্থের কোনও অভাব নেই। এই কেন্দ্রীয় সরকার গত কয়েক বছরে দশ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করেছে পুঁজিপতিদের। ওদের অন্য অনেক ভর্তুকির কথা তো বাদ দিলাম। এই টাকার সামান্য একটা অংশ খরচ করলেই সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা যায়, দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

কিন্তু সে ক্ষমতা মোদী-অমিত শাহর নেই। কংগ্রেসের ফেলে যাওয়া জুতোয় ওরা পা গলিয়েছেন, মালিকের সেবায় কায়মনোবাক্য সমর্পণ করেছেন। আর এ কাজ করতে হলে অনৃতভাষণ দিতে হবে, মানুষকে ভুল বোঝাতে হবে। তা না পারলে যে আম্বানি-আদানি জাতীয় প্রভুদের গোঁসা হবে। আর গোঁসা হলেই সর্বনাশ। গদি চলে যাবে যে!

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফুটিগোদা-২ লোকাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড রথীন রায় ৯ আগস্ট শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। মৃত্যুর খবর পেয়ে ফুটিগোদা ও শাহাজাদাপুর অঞ্চলের দলের কর্মী সমর্থকরা তাঁর বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান। দলের পলিটবুরো সদস্য, জেলা সম্পাদক, জননেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের পক্ষে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কমরেড রথীন রায় পারিবারিক সূত্রে দলের সংস্পর্শে আসেন। মূলত তাঁর দাদা কমরেড অহীন রায়ের সান্নিধ্যে বাল্যকাল থেকে দলের কাজকর্মের সাথে যুক্ত হন। কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ডিএসও কর্মীর ভূমিকা পালন করেন।

ফুটিগোদা-শাহাজাদাপুর এলাকাগুলিতে তখন কংগ্রেসি জোতদার-জমিদারদের ব্যাপক দাপট। তাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত, কথা বলার অধিকার নেই। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড শচীন ব্যানার্জী, সুবোধ ব্যানার্জী ও পরবর্তী সময়ে কমরেড ইয়াকুব পৈলান, আমির আলি হালদারের নেতৃত্বে এলাকায় প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনে কমরেড রথীন রায় কর্মী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। এই পথেই সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। এই মৃদুভাষী কমরেড দলের কর্মী হিসেবে এলাকার মানুষের খুবই প্রিয়জন ছিলেন এবং পঞ্চায়েতে জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেন। নতুন ছাত্র-যুব কর্মীদের কাজকর্মের পরামর্শ, তাদের খাওয়া-দাওয়া থাকার বিষয়ে খোঁজখবর রাখতেন। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে দলের এক কর্মীকে ডেকে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস ৫ আগস্ট উপলক্ষে দলের তহবিলে অর্থ দেন।

২৩ আগস্ট তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুবীর দাস সহ গৌর মিস্ত্রি, রামকুমার মণ্ডল, অমূল্যধন মণ্ডল, শক্তি হালদার, খগেন্দ্রনাথ কয়াল, অমিয় রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সুকুমার হালদার।

কমরেড রথীন রায় লাল সেলাম

বিদ্যাসাগরের সমাজমুক্তির স্বপ্ন সফল করার অঙ্গীকারই হোক তাঁর দ্বিশত জন্মবর্ষে দেশবাসীর প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবর্ষ পূর্ণ হল। ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর শুধু এ রাজ্য নয় সারা দেশেই অনুপ্রেরণার এক বিরল দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবনসংগ্রামের গভীর চর্চা এবং সেখান থেকে যুগোপযোগী শিক্ষা নিয়ে বর্তমান এই পচে যাওয়া সমাজের পরিবর্তনের জন্য, কোটি কোটি শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালানো আজ বিদ্যাসাগর অনুরাগী প্রতিটি দেশবাসীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বোন্নত উপলব্ধি ভিত্তিতে বিদ্যাসাগর চরিত্রের যে অসাধারণ মূল্যায়ন উপস্থিত করেছেন তার ভিত্তিতে যদি আমরা বিদ্যাসাগরের জীবন চর্চা করি তবেই তাঁর বুকের ব্যথাকে আমরা সত্যিই উপলব্ধি করতে পারব এবং সেই অনুযায়ী সামাজিক দায়িত্ব পালনে আমাদের ভূমিকা পালন করতে পারব।

গণদাবীর পাতায় সেই চেষ্টার অঙ্গ হিসাবে আমরা গত বছর থেকে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যাসাগরের জীবনসংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই উদ্যোগ হাজার হাজার পাঠকের দ্বারা যেমন বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে তেমনই এই কাজটা করতে গিয়ে আমরাও নতুন করে অনেক কিছু শিখেছি, পুরনো উপলব্ধি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। বাস্তবে, বিদ্যাসাগরের গোটা জীবনসংগ্রামটাই এমন যে, আন্তরিকভাবে তার সংস্পর্শে কেউ এলে, উদ্বুদ্ধ তিনি হবেনই। বিবেক তার জাগ্রত হবেই। কিন্তু শুধু উদ্বুদ্ধ হওয়াই তো যথেষ্ট নয়। বিদ্যাসাগর যে আধুনিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে আধুনিক উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যে স্বপ্ন আজও অপূরিত। তা পূরণ করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা যদি সঠিক পথে না হয় তবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সফল হবে না। তাই, একদিকে চাই বিদ্যাসাগরের জীবন-সংগ্রামের গভীর চর্চা, অন্য দিকে একই সঙ্গে চাই বর্তমান সমাজের উপর নেমে আসা শাসক শ্রেণির প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম।

বিদ্যাসাগর তাঁর সমকালে যে সমাজ দেখেছিলেন তা ছিল অশিক্ষা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধতা, আর কুসংস্কারে ভরা। জাত-পাত-বর্ণের নামে নিচের তলার মানুষের উপর চলত অমর্যাদাকর আচরণ ও অকথ্য অত্যাচার। মানুষ হিসাবে নারীর কোনও মর্যাদা ছিল না। পুরুষতন্ত্রের নিগড়ে নারীর জীবন নিষ্পিষ্ট হত। সমাজের এই রকম একটা ভয়ঙ্কর অবস্থাকে বদলানার কঠিন পণ নিয়ে লড়াই শুরু করেছিলেন বিদ্যাসাগর। আজ তাঁর জন্মের দ্বিশত বর্ষের শেষে এসে তাঁর এই লড়াই থেকে যে অন্যতম প্রধান শিক্ষাটা আমাদের গ্রহণ করা দরকার তা হল, প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও কী ভাবে আপন লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হয়। তথাকথিত নাম যশ ইত্যাদির মোহ থেকে কী ভাবে মুক্ত থাকতে হয়। কী ভাবে মিথ্যা মর্যাদাবোধের গণ্ডি ছাড়িয়ে যথার্থ মর্যাদাবোধের স্তরে নিজেকে উন্নীত করতে হয়।

বিদ্যাসাগর বর্ণভেদপ্রথার বিরুদ্ধে বই লেখেননি। অনায়াসে মিশে গেছেন তথাকথিত নিম্নবর্ণ, নিম্নশ্রেণির মানুষের সঙ্গে। হয়ে উঠেছেন তাঁদের একান্ত আপনার জন। ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অন্যদের জন্য শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছেন। এখনকার তথাকথিত স্মার্ট যুগে কত জন শিক্ষিত মানুষ বিদ্যাসাগরের মতো জাতপাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে আপন ভাবতে পারে?

বিদ্যাসাগর একটা সময়ে অর্থ উপার্জন করেছেন প্রচুর। তার প্রায় সমস্তই তিনি ব্যয় করেছেন জনসাধারণের জন্য স্কুল নির্মাণে ও পরিচালনায়, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলায়, বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায়। তিনি দীর্ঘ কাল কলকাতায় ছিলেন কিন্তু নিজের থাকার জন্য একটা বাড়ি পর্যন্ত করেননি। জীবনের শেষ দিকে এসে বইপত্র রাখার জন্য (প্রায় ৫০ হাজার বই ছিল তাঁর সংগ্রহে) বাদুড়বাগানের বাড়িটি করেছিলেন। পরে সেখানেই তিনি থাকতেন।

বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত সম্পর্ক অপেক্ষা ব্যক্তির গুণের ভিত্তিতে দেখার শিক্ষা রেখে গেছেন। পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করতেন তাঁদের কোমল এবং উন্নত হৃদয়বৃত্তির জন্যই। কখনও অন্যথা দেখলে স্পষ্টভাষায় তাঁদেরও সমালোচনা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি তিনি। আমরা প্রায়শই আপনজনের দোষ আড়াল করার চেষ্টা করি। যোগ্যতা এবং গুণাবলি না থাকলেও অন্যায়ভাবে আপনজনদের সুযোগসুবিধা দিই। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এসব হীন দুর্বলতার লেশমাত্র ছিল না।

বিদ্যাসাগরের চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, 'অজেয় পৌরুষ', 'অক্ষয় মনুষ্যত্ব'— এই দুটি বৈশিষ্ট্য অর্জনের সংগ্রাম ছাড়া আজও যথার্থ মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। আজ সমাজের উপর, সাধারণ শ্রমজীবী জনতার জীবন-জীবিকার উপর 'নয়া শিক্ষানীতি'র নামে, 'কৃষি সংস্কার বিল'-এর নামে, 'শ্রম আইন সংস্কার'-এর নামে যে ভয়াবহ আক্রমণ ভারতের শাসকশ্রেণি নামিয়ে আনছে, তার বিরুদ্ধে সত্যিকারের একটা লড়াই সংগঠিত করতে হলে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। নিপীড়িত-শোষিত মানুষের জন্য গভীর ভালবাসা এবং সেই ভালবাসার ভিত্তিতেই তাদের জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়াই করতে পারার তেজ ও সাহস অর্জন আমাদের প্রত্যেককে করতেই হবে।

বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ করে নানা গোষ্ঠীর নানা আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। তারা বিদ্যাসাগরের জীবন-সংগ্রামের মূল ভিত্তি যে পার্থিব মানবতাবাদী আদর্শ, তার চর্চা করবে না শুধু নয়, তাঁকে শুধুমাত্র দয়ারসাগর, করুণাসাগর কিংবা শিক্ষা সংস্কারক হিসাবেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইবে। নয় তো বিদ্যাসাগরকে নিছক পাথরের মূর্তি বানিয়ে রেখে দেবে। আর কিছু লোক তাঁর মহান সংগ্রামকে খাটো করার চেষ্টায় তাঁর কাজকর্মের অপব্যাখ্যা করবে। বিদ্যাসাগরের চিন্তার প্রভাব একসময় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যাঁরা আধুনিক চিন্তাভাবনা নিয়ে সমাজগঠনে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সেই সেই রাজ্যের 'বিদ্যাসাগর' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। বাস্তবে তাঁরা অধিকাংশেই বিদ্যাসাগরের চিন্তা এবং সংগ্রামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের নানা লেখা তাঁরা নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করেছিলেন। এসব ঘটে ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনকালেই। কিন্তু ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগরকে জনমন থেকে মুছে ফেলার পরিকল্পিত চেষ্টা হয়েছে। যে বিদ্যাসাগর ভারতে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের পথ তৈরি করলেন, তার জন্য সর্বস্ব দিলেন তাঁকে 'ভারতের শিক্ষাবিদ' নামক কোনও তালিকায় খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি 'আধুনিক ভারতের নির্মাতা' শীর্ষক বইপত্রেও বিদ্যাসাগর অনুপস্থিত। এটা কি এমনি এমনি হচ্ছে? একদমই তেমনটা নয়। এটা হচ্ছে কারণ, বিদ্যাসাগর রামমোহনের শুরু করা নবজাগরণ আন্দোলনে গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। এ দেশে আধ্যাত্মবাদ মুক্ত মানবতাবাদী ভাবনাকে সমাজের গভীরে প্রোথিত করার জন্য ধর্মীয় চিন্তাপদ্ধতি সম্পূর্ণ বাতিল করতে চেয়েছিলেন। ধর্মের সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেছিলেন, ধর্মীয় শাস্ত্রের অসারতা তুলে ধরেছিলেন। সেই যুগে সাংখ্য ও বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলে ঘোষণা করার অসীম সাহস দেখিয়েছিলেন। মার্কসবাদী দার্শনিক শিবদাস তাঁকে বলেছেন একজন 'খাঁটি হিউম্যানিস্ট'। আজকের ভণ্ড গণতন্ত্রীদের, তাই বিদ্যাসাগরকে এত ভয়। স্বাধীন ভারতের সব সরকারই তাঁর চরিত্রকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে, আজও করে চলেছে।

আজ আধুনিক শিক্ষাকে ধ্বংস করে পুরাণ-গল্পকথাকে, জীর্ণ লোকাচারকে সিলেবাসে ঢোকানোর চেষ্টা পুরোমাত্রায় চলছে। জনমনে অন্ধতা-কুসংস্কার আরও বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা চলছে। চেষ্টা চলছে ইতিহাসের চাকাকে পিছনে দিকে ঘোরানোর। এই সব অপচেষ্টাকে আদর্শগত ভাবে অনেকখানি প্রতিরোধ করা সম্ভব বিদ্যাসাগরের জীবন-সংগ্রামের সক্রিয় চর্চার দ্বারা। তাই, দ্বিশত জন্মবর্ষের এই প্রয়াশই শেষ নয়, বিদ্যাসাগরের চর্চা যেন সমাজ জুড়ে অব্যাহত থাকে। তাঁর অপূরিত স্বপ্ন যেন দেশবাসীর অন্তরে, আমাদের বিবেকে সদা জাগ্রত থাকে। তাঁকে নিয়ে আরও চর্চা চলুক, তাঁর জীবনের অনালোচিত আরও নতুন নতুন দিক সামনে আসুক। কিন্তু নিছক আলোচনা আর মাল্যদানের মধ্যে যেন তাঁকে আমরা আবদ্ধ না রাখি। তাঁর চরিত্রের মর্মবস্তুকে আজকের সর্বোন্নত চিন্তার আলোকে প্রতিনিয়ত পরিশুদ্ধ করে আমরা সমাজমুক্তির সংগ্রাম কঠিনতর পরিস্থিতিতেও জারি রাখব, এই হোক এই বিশেষ সময়ের অঙ্গীকার।

এ সরকার কাদের জন্য?

একের পাতার পর

নিল সেন্ট্রাল ভিস্টার মতো প্রকল্প। একে সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অসংবেদনশীলতা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়! একটি হিসাব বলছে, এই টাকায় অনায়াসে তৈরি করা যেত দিল্লির এআইআইএমএস-এর মতো উঁচু মানের ১৫টি হাসপাতাল। একটু খাবারের জন্য হন্যে হওয়া দেশের মানুষকে বিনা পয়সায় আরও দীর্ঘদিন ধরে খাবার জোগানো যেত। প্রতিটি মানুষের হাতে তুলে দেওয়া যেত কিছু কিছু করে অর্থ, যাতে কেনাকাটা করে তাঁরা অর্থনীতিকে সচল রাখতে পারেন। জাতীয় শিক্ষানীতিতে ঢাক পিটিয়ে বলা হয়েছে সমস্ত শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনতে ঢেলে সাজানো হবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে। এই টাকায় কার্যকরী ভাবে তা করা যেত, বেহাল স্কুলগুলিরও হাল ফেরানো যেত। করা যেত আরও বহু কিছু, শুধু যদি কেন্দ্রীয় সরকারের মাথায় দেশের খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের দুরবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণাটুকু থাকত। তা যে নেই, সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা যে শুধুই দেশের আসল মালিক পুঁজিপতিদের মুনাফার থলির আকার ঠিক রাখার ব্যবস্থা করতেই নিবেদিতপ্রাণ, এই সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রকল্প তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বিজেপি সরকারের এক সংসদীয় মন্ত্রী আবার সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রকল্পের যৌক্তিকতা বোঝাতে গিয়ে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের দোহাই দিয়ে বলেছেন, তাঁরাই বলে থাকেন, টাকা খরচ করলে অর্থনীতি সচল থাকবে। সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রকল্পে সেটাই করা হচ্ছে। তাঁর কাছে প্রশ্ন, বিশেষজ্ঞরা কি এই পথে টাকা খরচের পরামর্শ দিচ্ছেন? এভাবে এই বিপুল টাকা খরচের দ্বারা অর্থনীতির কী বিশেষ উপকার হবে? এখন তো প্রয়োজন ছিল, স্থায়ী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকল্যাণমূলক খাতে বেশি করে টাকা সরবরাহ করা। যাতে কর্মসংস্থানের হার কিছুটা বাড়ে, মানুষের হাতে টাকা আসে। পাশাপাশি জীবনধারণ নিশ্চিত হয় খাদ্যহীন মানুষের। তা না করে এই দুর্যোগের কালে রাজধানী শহরকে জাঁকালো রূপ দিতে পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন তাঁরা! এ তো অনাহারী মানুষের চোখের সামনে বসে থালা ভরা সুস্বাদু পোলাও-কালিয়া খাওয়ার মতোই চূড়ান্ত রুচিহীন গর্হিত একটা কাজ!

লকডাউনে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বিরাট সংখ্যক মানুষ, যাদের একটা অংশ আজ অনাহারের মুখে দাঁড়িয়ে, তাদের পাশে দাঁড়ানো, সেই মানুষগুলির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া— এমন আচরণই তো প্রত্যাশিত একটা গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে। যাদের ভোটে সরকারে বসেছে, তাদের প্রতি এটা তো তাদের ন্যূনতম দায়বদ্ধতা। অথচ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সেদিকটা থেকে সম্পূর্ণ চোখ ফিরিয়ে বিপুল টাকা খরচ করে নিজেদের প্রিয় পাত্র পুঁজিমালিকদেরই আরও খানিকটা সুবিধা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করল। এই আচরণ ভুলবে না দেশের মানুষ। ক্ষমা করবে না পুঁজিপতিদের নির্লজ্জ দালাল এই সরকারের নিষ্ঠুর কার্যকলাপ।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ শিক্ষার বেসরকারিকরণ কেন্দ্রীকরণ ও গৈরিকীকরণের রাস্তা খুলে দেবে

গত ২৯ জুলাই ভারতীয় নবজাগরণের পার্থিব মানবতাবাদী ধারার বলিষ্ঠ প্রতিনিধি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০-র আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ওই বিশেষ দিনটির তাৎপর্য স্মরণে ছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু এই মনীষীর দ্বিশত জন্মবর্ষের কোনও উল্লেখ ছিল না! না থাকাটাই বোধহয় স্বাভাবিক, কারণ এই শিক্ষানীতিতে ২৫০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ আছে, অথচ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ শাসনে বঙ্গদেশে রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহারাষ্ট্রে জ্যোতিরাও ফুলে প্রমুখের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টায় যে ভারতীয় নবজাগরণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যার ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন— অত্যন্ত দুঃখের হলেও, তার কোনও স্বীকৃতি নেই। গত বছরের ৪৮৪ পৃষ্ঠার প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির খসড়াটি প্রায় অপরিবর্তিত রেখে ৬৬ পাতায় সংক্ষেপিত রূপে প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতির এই নথিটি বিগত ১৯৮৬ জাতীয় শিক্ষানীতির নথির মতোই অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভাষায় শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার কথা এবং তথাকথিত ভাল ভাল প্রস্তাবে পূর্ণ, যা সাধারণ মানুষকে এমনকি বহু শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করতে সক্ষম।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। এবারের শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক পর্বের তিন থেকে ছয় বছরের শিশুদের সাথে প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিকে যুক্ত করে একটি 'ফাউন্ডেশন গ্রুপ' তৈরি করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক অংশটি পুরোপুরি অঙ্গনওয়াড়ির হাতে থাকবে। শিশুদের পুষ্টি বাড়ানোর জন্য মিড ডে মিল এর সাথে সকালে ভালো প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু অর্থের জোগান কে দেবে? বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার? ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলছে। ২০১৩-১৪ সালে বিগত ইউপিএ সরকারের আমলে মিড ডে মিলের জন্য বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৩,২১৫কোটি টাকা, কিন্তু এ বছরের বাজেটে (২০২০-২১) ধার্য হয়েছে মাত্র ১২,০৫৪ কোটি টাকা (সূত্র ঃ কেন্দ্রীয় বাজেট নথি ২০১৩-১৪ এবং২০২০-২১) পাঁচ শতাংশ প্রতি বছরে মুদ্রাস্ফীতিকে হিসাবে ধরলে ২০১৩-১৪কে ভিত্তিবর্ষ ধরে সাত বছর পর ২০২০ সালে মিড ডে মিলের জন্য বরাদ্দ হওয়া উচিত ছিল কমপক্ষে ১৮ হাজার কোটি টাকা। যদিও বরাদ্দ হয়েছে তার অর্ধেক! তাহলে পুষ্টিকর আহার এবং সকালের পুষ্টিকর টিফিনের ব্যবস্থা কীভাবে হবে? বর্তমান শিক্ষানীতিতে এর জবাব নেই। ফলে শুনতে ভাল হলেও প্রস্তাবটি কার্যকর করার চেষ্টাই অনুপস্থিত। এ ধরনের ফাঁকি নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির প্রায় প্রতিটি পর্বে খুঁজে পাওয়া যাবে।

গত বছর ১ জুন বিজ্ঞানী কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ পেশ করার পর থেকেই দেশজুড়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। অভিযোগ উঠেছে সংঘ পরিবারের অনুগত ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠন (অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং অখিল ভারতীয় শিক্ষণ মহামণ্ডল), তাদের পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে এই নয়া শিক্ষানীতি তৈরি হয়েছে। অন্যান্য স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ ও বিরোধী মতামত এবং পরামর্শকে যথারীতি ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। বর্তমান শিক্ষানীতিতে সুললিত বাক্য বিন্যাসের চাতুর্যে ও ভাল ভাল কথা ও প্রস্তাবের আড়ালে সুলভ, সার্বজনীন, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মূল সমস্যাগুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা কর্তৃক নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদিত হওয়ার পর থেকেই বিতর্ক এবং বিরোধ চরমে পৌঁছেছে। দেশের একটা বড় অংশ বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাপ্রেমী মানুষ এর বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছেন। অপরপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষ ও প্রধানদের এই শিক্ষানীতির পক্ষে প্রচারের জন্য কাজে লাগাচ্ছেন। এরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং প্রচারমাধ্যমে সরকারি শিক্ষানীতির পক্ষে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন।

এবারের নয়া শিক্ষানীতি-২০২০ শিক্ষাক্ষেত্রে জিডিপি-র ৬ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দের কথা বলেছে। স্বাধীনতার কিছুদিন পরেই দেওয়া কোঠারি কমিশনের এই পরামর্শ আজ পর্যন্ত কোনও সরকারই মুখে অস্বীকার করেনি, কিন্তু কার্যকরও করেনি। নয়া শিক্ষানীতিতে এর পক্ষে যুক্তির অবতারণা করা হলেও বাস্তব কিন্তু উল্টো কথাই বলছে। বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাগিদারি ক্রমশ কমছে! ২০১৪-১৫তে ০.৫৩ শতাংশ থেকে কমতে কমতে ২০২০-২১ শে ০.৪৪ শতাংশ (বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে জিডিপির মোট ব্যয় ২.৭১-৩ শতাংশে) এসে দাঁড়িয়েছে। এবারের শিক্ষানীতিতে বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক সংস্থার অংশগ্রহণের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সরকারি অংশীদারিত্বের প্রশ্নে এই শিক্ষানীতি নীরব! এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য থেকে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত হয়— ২০১৯-২০ বাজেটে শিক্ষা সেস বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় হয়েছে ৩.৩৮ লক্ষ কোটি টাকা। আর কেন্দ্রীয় সরকার ২০২০-২১ শিক্ষা বাজেটে ধার্য করেছে ৯৯ হাজার ৩০০ কোটি টাকা যা আয়ের এক-তৃতীয়াংশ নয়! (সূত্র বাজেট সংক্রান্ত নথি ৩০ জুন ২০১৯ ও ২০২০) এটা কি দেশের মানুষের সাথে প্রবঞ্চনা ও তঞ্চকতা নয়? ফলে বাড়ছে বেসরকারি ও কর্পোরেট সংস্থার অংশীদারিত্ব যা অবশ্যম্ভাবীরূপে শিক্ষাকে ব্যয়বহুল ও মহার্ঘ করে তুলেছে।

স্বাধীনতার পূর্বে শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশে জাতীয়তাবাদী শিক্ষা প্রসারে 'জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ' গঠন ও তার উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা। এর পাশাপাশি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্থাপিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও পন্ডিত মদনমোহন মালব্যের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো মহৎ উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী কালেও তার রেশ কিছুটা ছিল। ফলে জনসাধারণের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল বহু স্কুল ও কলেজ, যা পরবর্তীকালে সরকার দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের তাগিদে বিভিন্ন ধর্মের কিছু সংস্থা স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এটাকে বাদ দিলে আর যা বেসরকারি উদ্যোগ তার বেশিরভাগটাই বাণিজ্যিক লক্ষ্যে পরিচালিত।

এবারের জাতীয় শিক্ষানীতিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রশ্নে পিপিপি মডেলের জয়গান করা হয়েছে। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলছে কলকাতার যাদবপুরে কে এস রায় টিবি হাসপাতালকে বিগত রাজ্য সরকারের আমলে পিপিপি মডেল চালাবার জন্য প্রাইভেট ম্যানেজমেন্টের হাতে তুলেদেওয়া হয়েছিল মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য। এর ফল হয়েছে, ওই প্রতিষ্ঠানে ডাক্তারি পড়ার জন্য অত্যন্ত চড়া হারে (সরকারি কোটায় ৮-১০ লক্ষ, ম্যানেজমেন্ট কোটায় ৪০ লক্ষ ও এন আর আই কোটায় ১.৫-২ কোটি টাকা) ফি দিতে হচ্ছে! সারা দেশে প্রাইভেট প্রফেশনাল কলেজগুলোর চিত্রটা কমবেশি একই রকম অথবা এর চেয়েও খারাপ। ২০০১-০২ সালে সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে মন্তব্য করেছিল কোথাও ক্যাপিটেশন ফি নেওয়া চলবে না। ফি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল শুধুমাত্র যৌক্তিক উদ্বৃত্ত (রিজিনেবল সারপ্লাস) যা প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধনের কাজে লাগবে, সেটাই ফি হিসেবে ধার্য করতে হবে। এবারের শিক্ষানীতিতে সেই কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ঠিক উল্টোটাই ঘটছে। ম্যানেজমেন্ট কোটায় ভর্তি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা (কর্ণাটক সরকারের ফিজ রেগুলেটরি অথরিটি রিপোর্ট ২০১৮ দ্রষ্টব্য) কোথাও কোথাও কোটি টাকাও আদায় করা হচ্ছে। সরকারি শিক্ষানীতির সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা ও প্রচার মাধ্যম সম্ভবত এসব খবর রাখেন না।

এবারের শিক্ষানীতির অন্তঃসারশূন্যতার আরও একটি উদাহরণ হল— নয়া শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং সম্ভব হলে পরবর্তীকালেও শুধুমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান হবে। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়, এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি প্রথম শ্রেণি থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করেননি? আমরা সাধারণ মানুষেরা তো তাই করেছি। বর্জন করা হবে বিদেশি (!) ভাষা ইংরেজিকে। প্রশ্ন উঠত প্রাইভেট স্কুলের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য হবে? গত ৭ আগস্ট 'এডুকেশন কনক্লেভে' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বড় গলায় এটি ঘোষণাও করেছেন। কিন্তু কী আশ্চর্য তার পরদিনই সিবিএসই-র চেয়ারম্যান ঘোষণা করলেন এটা সম্ভব নয়! সিবিএসই অনুমোদিত স্কুলে ইংরেজি মাধ্যমেই পড়াশোনা হবে। না হলে নেতা-মন্ত্রীদের বা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরা কোথায় পড়বে? নয়া শিক্ষানীতির এমন মহৎ 'ঘোষণার' কী মর্মান্তিক পরিণতি! অন্যান্য 'মহৎ' ঘোষণাগুলোর কী পরিণতি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মশাই বহুল প্রচারিত একটি সংবাদপত্রে লিখেছেন, 'শিক্ষা কখনোই টাকা কামানোর উপায় হতে পারে না— এই আদর্শের উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি তৈরি হয়েছে'। ভাল কথা। তাহলে এবারের শিক্ষানীতিতে যে ১০০টি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে এদেশে ক্যাম্পাস খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তারা কি এদেশে দানছত্র খুলতে আসবে? বাজার অর্থনীতির যুগে শিক্ষা তো আজ বিশ্ববাজারের লোভনীয় পণ্য। প্রায় কুড়ি বছর আগে কেন্দ্রের বাজপেয়ী সরকার নিযুক্ত 'বিড়লা-আম্বানি কমিশন' বলেছিল, 'এডুকেশন সেক্টর ইজ মাচ মোর প্রফিটেবল দ্যান ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড এগ্রিকালচার'। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদিজির সাথে গুগলের প্রধান সুন্দর পিচাই-এর একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে গুগল সংস্থা আগামী কয়েক বছরে ডিজিটাল শিক্ষা ও তার পরিকাঠামো তৈরির জন্য ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা বলেছে। তারাও নিশ্চয়ই দানছত্র খুলতে আসছে না। এভাবেই হয়ত আমাদের দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে জিডিপির ৬ শতাংশের 'লক্ষ্যমাত্রায়' পৌঁছাবে। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'প্রাইভেট পার্টিসিপেশন' এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব আর্থিক মহামন্দার যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ কি মুনাফার সন্ধান করবে না? নাকি মোদিজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে বনের বাঘ হঠাৎ করে মাংস ছেড়ে দিয়ে ঘাস খেতে শুরু করবে?

ওই নিবন্ধে উপাচার্য মশাই লিখছেন, 'সবচেয়ে মজার কথা যারা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে বেশি সরব তারা অনেকেই আমেরিকার আইভি লিগ-এর সঙ্গে যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলার সময় এই পন্থার জোরালো সমর্থক হয়ে ওঠেন'। এই তথ্য কোথায় পেয়েছেন তিনি ভাল বলতে পারবেন। তবে একথা বলতে পারি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বাঘা বাঘা ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সন্তানরা উপরোক্ত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। করুন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু তা কি সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে, নাকি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে? অথচ এই নেতারাই দেশের মানুষের কাছে 'আংরেজি হটাও' স্লোগান তোলেন। সংস্কৃতের পূজারী হয়ে পড়েন। বর্তমান শিক্ষানীতিতে যেখানে ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক শিক্ষানীতির নাম করে সেখানে দেশভক্ত রাষ্ট্রনেতারা যদি দয়া করে 'আপনি আচরি ধর্ম শেখাও অপরে' করতেন তাহলে ভালো হত। আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে সংস্কৃত শিক্ষার প্রশ্নে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'দি স্যাংস্কৃট সিস্টেম অব এডুকেশন উড বি বেস্ট ক্যালকুলেটেড টু কিপ দিস কান্ট্রি ইন ডার্কনেস'। ১৮৫৩ সালে শিক্ষা সংস্কারের প্রশ্নে অধ্যাপক ব্যালেন্টাইনের চিঠির জবাবে বিদ্যাসাগর প্রায় অনুরূপ কথা

পাঁচের পাতায় দেখুন

২৫ সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ভারত বনধ-এর সমর্থনে

জেলায় জেলায় সভা ও মিছিল

বেহালা

মধ্য কলকাতার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড়

দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড়

পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা

জীবনাবসান

কলকাতার অবিভক্ত টালিগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড নিত্যরঞ্জন চক্রবর্তী ১৭ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

সত্তরের দশকের শেষ দিকে তাঁর দাদা প্রয়াত কমরেড সত্যরঞ্জন চক্রবর্তীর অসুস্থতার সময় চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার সূত্রে দলের নেতাদের সাথে পরিচয়। এর মধ্য দিয়েই দলের চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন। কর্মসূত্রে বর্ধমানে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে আশির দশকের শেষের দিকে শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে প্রয়াত কমরেড অধীর সরকার ও ছোট ভাই প্রয়াত কমরেড বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তীর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে বিদ্যুৎ আন্দোলনেও তিনি ভূমিকা পালন করেন। কমরেড নিত্যরঞ্জন চক্রবর্তী বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলের মধ্যেই পার্টির বার্তা বহন করে নিয়ে যেতেন। পরিচিত সকলের থেকেই পার্টির আন্দোলন তহবিল ও বৃত্তি পরীক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। একমাত্র কন্যাকে দলের কাজ করতে উৎসাহিত করতেন। মৃত্যুর আগেও বারবার কন্যাকে বলেছেন, ভালো করে দলের কাজ করে যেও।

শেষ কয়েক বছর অসুস্থতার কারণে নিয়মিত সাংগঠনিক কাজে যেতে না পারলেও গণদাবী ও পার্টির অন্যান্য বইপত্র খুব খুঁটিয়ে পড়তেন। পার্টির ওপর ছিল অগাধ আস্থা। দলের ছোটদের পিতৃস্নেহে কাছে টেনে নিতেন অকৃত্রিম ভালোবাসায়। অসুস্থতাজনিত তীব্র কষ্টের সময়েও কোনও দিন বিচলিত হননি, হাসিমুখে বলেছেন, ভালো আছি। কমরেডদের খোঁজ নিয়েছেন, দলের কাজকর্মের খোঁজ নিয়েছেন। কমরেড নিত্যরঞ্জন চক্রবর্তীর মৃত্যুতে দল হারাল একজন দরদি ও উদার মনের কর্মীকে।

কমরেড নিত্যরঞ্জন চক্রবর্তী লাল সেলাম

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০

চারের পাতার পর

লিখেছিলেন। প্রশ্ন জাগে, কারা বেশি দেশপ্রেমিক ও শিক্ষাব্রতী—রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর না বিজেপি নেতারা?

ওই উপাচার্য মশাইয়ের ধারণা,'উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সার্বভৌমত্ব কোনভাবেই খর্ব হবে না এই রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতিতে'। তিনি কীভাবে বললেন এ কথা জানি না, তবে এই শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোনও নির্বাচিত সংস্থা থাকবে না বলে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পরিচালনা করার জন্য যে নির্বাচিত সেনেট সিন্ডিকেট অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও কোর্ট এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে নির্বাচিত পরিচালন সমিতি থাকত তা ভবিষ্যতে আর থাকবে না। সরকার মনোনীত পরিচালন সমিতিগুলি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালনা করবে যা সার্বভৌম, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিপন্থী। নির্বিবাদে সরকারি হুকুম তামিল করা ছাড়া তাদের আর কোনও ভূমিকা থাকবে না। সর্বস্তরে ব্যাপক প্রতিবাদের কারণে খসড়া শিক্ষানীতিতে প্রস্তাবিত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত 'আরএসএ-এর পরিবর্তে তারা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে সিএবিই (যা এতদিন পর্যন্ত একটি পরামর্শদানকারী সংস্থা ছিল) তাকে চূড়ান্ত ক্ষমতাশালী করার কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে দেশে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণের বিপদ দেখা দিয়েছে। মনে রাখা দরকার শিক্ষা কেন্দ্র রাজ্যের যুগ্ম তালিকাভুক্ত। শিক্ষার এই চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর এক চূড়ান্ত আঘাত ।

সর্বশেষে বলি এবারের শিক্ষানীতিতে 'ফিলানথ্রপিক অর্গানাইজেশন'-এর অংশীদারিত্বের কথা বারবার বলা হয়েছে। আরএসএস-এর সহ-সচিব বলেছেন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের ৬০ শতাংশের বেশি পরামর্শ এই শিক্ষানীতিতে গ্রহণ করা হয়েছে। শাসক দলের ছাত্র সংগঠন এবিভিপিও একই কথা বলেছে। এই শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিকে অঙ্গনওয়াড়ির সাথে সাথে 'বাল বাটিকা', 'বনবাসী আশ্রম' (যা কিনা আরএসএসের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা) এর কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে একদম শিশু বয়স থেকেই কেন্দ্রের শাসকদলের দর্শন ও চিন্তাভাবনা (হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তান) ছাত্র-ছাত্রীদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন বহু শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাব্রতীরা। শিক্ষাক্ষেত্রে এই চূড়ান্ত সর্বনাশা আক্রমণের বিরুদ্ধে কি কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চুপ করে থাকতে পারেন? তাই এই বিতর্কিত শিক্ষা ও ছাত্র স্বার্থবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ সহ শিক্ষাপ্রেমী জনসাধারণ।

মার্কিন অর্থনীতি ও সে-দেশের শ্রমিক শ্রেণির দুরবস্থা

পুঁজিবাদী প্রচারমাধ্যম সাধারণভাবে মার্কিন দেশ সম্পর্কে বিশ্বজুড়ে একটা ধারণা প্রচার করে চলে— নব্য-উদারনীতিবাদী অর্থনীতির সফল রূপায়নের ফলে সে-দেশ এক স্বপ্নভূমি। অমিত সম্পদের অধিকারী সে দেশে প্রতিটি নাগরিকের জীবন সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর। বিলাসবহুল জীবনযাপনের আধুনিক নানা উপকরণ ও নিরাপত্তা সেখানে সুলভ; জীবনজীবিকা নিয়ে প্রতিদিনের দুশ্চিন্তামুক্ত ও স্বাধীন তাদের জীবন। কিন্তু ভিতরের খবরে একটু চোখ রাখলেই টের পাওয়া যায়— দুনিয়াজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী প্রচারমাধ্যমের এই প্রচার কতটা অন্তঃসারশূন্য। সে দেশের সাধারণ মানুষের জীবন আদৌ এতটা উজ্জ্বল ও রঙিন নয়। বরং বহু প্রেক্ষিতেই যথেষ্ট বিবর্ণ ও মলিন। আর বিশেষত আজকের করোনা অতিমারির সময়ে প্রচারের এই ফাঁপা বেলুন এমন চুপসে গেছে যে, ভিতরের ভয়াবহ অবস্থা রীতিমতো প্রকট। অতিমারির অভিঘাতে মাত্র কয়েক সপ্তাহেই এই তথাকথিত শক্তিশালী অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহজাত ও অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এবং অস্থিরতাই কেবল এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে এসে পড়েনি, সেই সঙ্গে তার ফলে সাধারণ মানুষ তথা শ্রমিক শ্রেণির ক্রমবর্দমান দুর্দশা, দারিদ্র, বঞ্চনাও আজ সমস্ত আড়াল খসিয়ে এসে পড়েছে সামনে।

করোনাপূর্ব পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক অসাম্য

কোনও দেশের সমাজ-অর্থনীতি কতটা সবল ও সম্পদশালী— তা বোঝার মাপকাঠিটা ঠিক কী? সম্পদ সৃষ্টি, বা উৎপাদনের পরিমাণ নয়, এর জন্য আমাদের তাকাতে হয় কীভাবে সেই উৎপাদিত সম্পদ বন্টন করা হচ্ছে তার দিকে। তার সঙ্গে দেখতে হয় মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি, যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, জীবিকা নির্ধারণের উপায়, আয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যক্রয়ের সামর্থ্য ও তার পরিমাণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার সুলভতা, প্রভৃতির কতটা সুব্যবস্থা রয়েছে। আর সেই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ— জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের সাধারণ মানের উন্নতি হচ্ছে কিনা, তাকেও হিসেবের মধ্যে রাখা।

এখন বিচার্য - এই মৌলিক মাপকাঠিগুলির ভিত্তিতে দুনিয়ার পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের প্রধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির অবস্থা ঠিক কী? প্রথমেই চোখ রাখা যাক উৎপাদিত সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রটিতে। আমেরিকার মূলধারার প্রচারমাধ্যমই বলছে— সে দেশের উচ্চতম আয়ের ২০ শতাংশ মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত ৮৬ শতাংশ সম্পদ। অর্থাৎ বাকি ৮০ শতাংশ মানুষের অধিকারে রয়েছে মাত্র ১৪ শতাংশ সম্পদ। বিগত ৫০ বছরের মধ্যে মার্কিন দেশের উচ্চ ও নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে আয়ের ফারাকও বর্তমানে সর্বোচ্চ (ওয়াশিংটন টাইমস, ২৭-০৯-২০১৯)। পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই এই পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। কারণ সমাজের এক অংশের হাতে ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার অর্থই হল সমাজের বাকি অংশের হাত থেকে তা বেরিয়ে যাওয়া এবং দারিদ্র ও অর্থনৈতিক দুর্দশার বৃদ্ধি ঘটা। একই মুদ্রার দুই পিঠের মতো এই দুটিকে পরস্পর থেকে পৃথক করা অসম্ভব। মার্কিন সরকারের নিজের সরবরাহকৃত তথ্য থেকেই এক্ষেত্রে তাদের অর্থনীতির তথাকথিত সাফল্যের নেপথ্যের অন্ধকার চিত্রটিও বেরিয়ে আসে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির উন্নয়নের চিত্রটি আসলে এমনই। এর ফলে জাতীয় সম্পদের বৃহদংশই ক্রমশ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে এসে জমা হতে থাকে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশা ও দারিদ্র বেড়েই চলে। বিশেষত ১৯৮০-র পর থেকে এই তথাকথিত উন্নয়নের গতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, যা এখনও চলছে। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রিডমান (১৯১২-২০০৬) পুঁজিবাদী উন্নয়নের এই চরিত্র সম্পর্কে বেশ খোলসা করেই বলেছেন— ব্যবসার এক ও একমাত্র সামাজিক দায়বদ্ধতা হল তার হাতে থাকা উপাদানকে এমনভাবে কার্যে নিয়োজিত করা যাতে মুনাফা ঘরে তোলা সম্ভব হয়। এছাড়া বাকি যা কিছু তা সমাজতন্ত্রের আওতায় পড়ে (http//prospect.org/economy/shareholder-capitalism-came-town/)। অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতি এখন এতটাই জনবিরোধী যে, যেসব পুঁজিবাদী তাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ এতদিন পুঁজিবাদের এই সর্বোচ্চ মুনাফামুখী চলনকে আড়াল করতে মালিক শ্রেণির সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়ে নানাবিধ মিষ্টি মোড়ক দেওয়া তত্ত্বের আমদানি করতেন, আজ তাঁরাও বাস্তব পরিস্থিতিটা খোলাখুলি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন।

১৯৮০-র দশকের শেষ দিক থেকে একটি নতুন শব্দবন্ধ উঠে এসেছে অর্থনৈতিক আলোচনায় — 'শেয়ারহোল্ডার ক্যাপিটালিজম'। ব্যাপারটা ঠিক কী? না, বিভিন্ন কোম্পানিগুলির এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হল 'শেয়ারহোল্ডার'দের শেয়ারের দাম যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করা। বর্তমানে একবিংশ শতব্দীতে পুঁজিবাদী দুনিয়ার যাবতীয় তত্ত্ব, আলোচনা ও বিবিধ কর্মকাণ্ড এখন এই ধারণাটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। এই তত্ত্বকে ভিত্তি করেই ওয়াল স্ট্রিট অর্থাৎ মার্কিন ধনকুবের গোষ্ঠীগুলির মুষ্টিমেয় ক্ষমতাধারী অংশ বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানিগুলির উপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। কিন্তু এভাবে কোম্পানিগুলিকে নতুন বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট পুঁজির জোগান আর দিতে পারছে না, বরং কোম্পানিগুলোর মুনাফাও এদের গহ্বরে চলে যেতে থাকায় পুনর্বিনিয়োগের পরিমাণও হ্রাস পাচ্ছে। সেই অর্থে স্টক মার্কেট কোম্পানিগুলির প্রকৃত মূল্য বাড়ানোর বদলে কমিয়ে দিচ্ছে। একধরনের অসাম্য তৈরি হচ্ছে। কারণ কারও ক্ষতি না হলে কেউ লাভ করবে কীভাবে? আর দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে লাভের কড়ি ক্রমশ বেশি পরিমাণে যাচ্ছে কেবল এই শেয়ারবাজারের নিয়ন্ত্রণকারী মধ্যসত্ত্বভোগীদেরই হাতে (http // neweconomics.org/uploads/files/NEF/SHAREHOLDER-CAPITALISM/E/latest.pdf) অর্থাৎ, ওয়াল স্ট্রিটের এইসব ফিনান্সিয়াররা আসলে স্টক মার্কেটকে ব্যবহার করছে দ্রুত লাভ করার একটি পদ্ধতি হিসেবে। 'শেয়ারহোল্ডার ক্যাপিটালিজমের' আসল স্বরূপ তাই এ রকমই। এ হল আধুনিক মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের একধরনের পরগাছা চরিত্র, যেখানে একচেটিয়া পুঁজির অধিপতি একটি ক্ষুদ্র ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী উৎপাদন ব্যবস্থা বা বন্টনের ক্ষেত্রে কোনও রকম অংশ না নিয়েই সমস্ত কোম্পানির শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের রোজগার শোষণ করে ফুলে ফেঁপে ওঠে।

অন্যদিকে বেকারত্বের হারের দিকে তাকালেও কোনও দেশের অর্থনৈতিক চালচিত্রের একটা ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু আমেরিকার ক্ষেত্রে বিষয়টা অতটা সোজা নয়। কারণ সেখানে বেকারত্বের কোনও সোজাসাপটা হিসেব প্রকাশ করাই হয় না। তাই সরকারিভাবে বেকারির যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়, তার আড়ালে সবসময়েই থেকে যায় বিপুল পরিমাণ লুক্কায়িত কর্মহীনতা। 'বুরো অব লেবার স্ট্যাটিস্টিকস অব ইউএস' কর্মহীনতার একাধিক সংজ্ঞা ধরে নিয়ে এই সংক্রান্ত বিবিধ হিসেব প্রকাশ করে থাকে। ফলে বিষয়টি সাধারণ মানুষের বোঝার পক্ষে বেশ জটিল হয়ে যায়। সরকারিভাবে 'ইউ-৩' হল সেইসব কর্মহীনদের পরিসংখ্যান, যারা সক্রিয়ভাবে চাকরি খুঁজছে। আবার 'ইউ-৬' হল তাদের পরিসংখ্যান, যারা অন্তত ১ বছর কাজ খুঁজেছে, কিন্তু শেষে না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। আবার যারা কাজ হারিয়ে পড়তে ফিরে গেছে বা কোনও কারণে অক্ষম হয়ে পড়েছে, যারা নিজেদের যোগ্যতামান অনুযায়ী কাজ পায়নি বা যোগ্যতার থেকে কম আয়ে কাজ কতে বাধ্য হয়, অথবা আংশিক সময়ের জন্য কাজ করে— এদের প্রত্যেকের হিসেব আলাদা আলাদা। ফলে এই হিসেবগুলিকে পাশাপাশি রেখে দেখলে করলে বরং বিষয়টি অনেক ভালো বোঝা যাবে। ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে ইউ-৩ হিসেবে আমরা পাই ৬২ লক্ষ মানুষের নাম। ঐ একই সময়ে ইউ-৬ হিসেবে সংখ্যাটি ৭৪ লক্ষ (ফোর্বস ২৫-০৯-২০১৮)। অর্থাৎ কর্মপ্রার্থীদের এক বিরাট অংশ কম আয়ের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এর উপর আবার আছে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে চোখে পড়ার মতো ফারাক। ২০১৯ এর জুনের হিসেব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে কর্মহীনের সংখ্যা যেখানে ৩.৩ শতাংশ, লাতিনোদের মধ্যে তা ৪.৪ শতাংশ আর কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে ৬.৬ শতাংশ (ব্রুকিংস ০১-০৮-১৯)।

লুকোনো কর্মহীনতা বোঝার আরেকটি উপায় হল সমাজের কর্মক্ষম বয়সের কত শতাংশ মানুষ সক্রিয়ভাবে কাজে অংশগ্রহণ করছে সেই হিসেবে একটু চোখ রাখা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন বা আইএলও) এবং বিভিন্ন দেশের সরকার এই হিসেব নিয়মিত প্রকাশ করে থাকে। সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে আমেরিকায় ২০০০ সালে যেখানে এই হার ছিল ৬৭.৩ শতাংশ। ২০০৯-র অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে তা নেমে এসে দাঁড়ায় ৬৪.৬ শতাংশে; আর এখন ২০২০-র মার্চ মাসে তা আরও নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ৬২.৭ শতাংশে। এই হিসেবের ক্রমাগত অবনমনই পরিষ্কার করে দেয় মার্কিন সমাজে কর্মহীনতা আসলে কী হারে বাড়ছে, যা সরকারি হিসেবে নানা জটিলতার মাধ্যমে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। অর্থনীতির হাল যদি ভালোই হয়, তাহলে তো কর্মক্ষম মানুষের কাজে অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। অথচ ঘটছে ঠিক উল্টো। এর কারণটা ঠিক কী? এর আসল উত্তর হল— আসলে সাধারণ দক্ষতার বেশিরভাগ মানুষই এখন আর পূর্ণসময়ের কাজ পাচ্ছেন না; তাঁদের চুক্তির ভিত্তিতে সল্প সময়ের জন্য নিতান্ত কম বেতনে নিয়োগ করা হচ্ছে; সেখানে না থাকছে কাজের কোনও নিরাপত্তা, না স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনওরকম সুযোগসুবিধা। কিন্তু এইসব সাময়িক ঠিকা কাজের দৌলতেই বেকারত্বের সরকারি হিসেব থেকে তাদের নাম বাদ চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে এই ধরনের অত্যল্প বেতনের ঠিকা কাজের জন্যই কর্মক্ষম মানুষের এক বড় অংশ কাজে যোগ দিতে নিরুৎসাহিত বোধ করছে।

অন্যদিকে মার্কিন ক্ষমতাসীন শ্রেণি আজকাল বলতে শুরু করেছে — ৩.৫ থেকে ৩.৭ শতাংশ বেকারি মানে বাস্তবে দেশে বেকারি বলে কিছু নেই। সবারই হাতে কাজ আছে। কিন্তু তাহলে তো সাধারণ মানুষের রোজগার বাড়ার কথা, তাদের অবস্থাও আরও ভালো হওয়ার কথা। বাস্তব অবস্থা কি তাই বলছে? সে দেশের সরকারের নিজের প্রকাশিত 'লেবার শেয়ার' হিসেব থেকেই সত্যিটা বেরিয়ে আসছে। 'লেবার শেয়ার' হল জাতীয় আয়ের (জিডিপি) যে অংশ শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা বাবদ খরচ করা হয়। জাতীয় আয়ের বাকি অংশটিকে 'প্রফিট শেয়ার' বলা হয়ে থাকে। জাতীয় আয়ের মধ্যে এই শ্রমিকদের ভাগ আমেরিকার ক্ষেত্রে ১৯৫৩ সালে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল— ৫১.৬ শতাংশ। ১৯৬৫'তে তা দাঁড়ায় ৪৯ শতাংশ; তারপর থেকে ক্রমাগত নামতে নামতে ২০১৪'তে তা পৌঁছয় মাত্র ৪১.৯ শতাংশে। ২০১৮ সালে তা সামান্য উঠে দাঁড়িয়েছে ৪৩.২ শতাংশে (ইউএস বুরো অব ইকনমিক অ্যানালাইসিস ২০১৯)। এই 'লেবার শেয়ার' হ্রাস পাওয়ার অর্থই হচ্ছে— শ্রমিকরা অর্থনীতির বিকাশের ভাগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমেরিকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সমীক্ষা থেকে যা উঠে এসেছে, তা হল মুদ্রাস্ফীতি ও বেতনবৃদ্ধিকে হিসেবের নিলে দেখা যাবে বেশিরভাগ মার্কিন শ্রমজীবী মানুষের বেতন বাস্তবে একই জায়গায় রয়ে গেছে। ঘন্টাপিছু সর্বোচ্চ আয়ের ৫০ শতাংশ কাজ ও সর্বনিম্ন আয়ের ৫০ শতাংশ কাজের মধ্যবর্তী মিডিয়ান রেখা আমেরিকায় ১৯৭৯ থেকে ২০১৯-এর মধ্যে, অর্থাৎ ৪০ বছরে, মাত্র ৬.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০.৭৬ ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২ ডলার। এর মধ্যে সর্বনিম্ন ১০ শতাংশের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার আরও কম— মাত্র ১.৬ শতাংশ। আবার কৃষ্ণাঙ্গ ও লাতিনোদের (আমেরিকার মোট জনসংখ্যার ৩১.৭ শতাংশ মানুষ) হিসেব আলাদা করে নিলে দেখা যাচ্ছে এদের আয় এই ৪০ বছরে বাড়ার বদলে উল্টে কমে গেছে (কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিস ২০১৯)।

সাতের পাতায় দেখুন

মার্কিন অর্থনীতি ও সে-দেশের শ্রমিক শ্রেণির দুরবস্থা

ছয়ের পাতার পর

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের তাতে অবশ্য কিছুই যায় আসে না। মালিকরা সেদেশে কারণে অকারণে শ্রমিকদের বসিয়ে দেয়, তাদের বেতন এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা ছাঁটাই করে, কারখানা বন্ধ করে দেয়, ধারের বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপায়, কম খরচে উৎপাদনের লোভে বিদেশে কাজ আউটসোর্স করে সেই দেশের সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল শোষণ করে। কিন্তু শ্রমিকরা যদি তাদের প্রাপ্য বেতন ও সুযোগসুবিধা দাবি করে, তাদের প্রতি বঞ্চনা, অসাম্য বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, সঙ্গে সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে, উৎপাদনে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে সেই প্রতিবাদকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। বিশ্বজুড়েই সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের রীতিই হল এই। মার্কিন দেশও তার কোনও ব্যতিক্রম নয়।

দারিদ্র পরিস্থিতি

বেকারি আর কম বেতনের নিতান্ত স্বাভাবিক ফল দারিদ্র। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকার ৪ কোটি মানুষ আজ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। গত ৫০ বছরে সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে (নিউ ইয়র্ক টাইমস, ১৬-০৪-২০২০)। আজকের অতিমারি পরিস্থিতির বহু আগেই, ২০১৯ সালের ফেডারেল রিসার্চ স্টাডিতেই উঠে আসছে— শতকরা ৪০ ভাগ আমেরিকানের হাতে বিপর্যয়ের সময় খরচ করার জন্য ৪০০ ডলারও মজুত থাকে না। এতে একটা চারজনের পরিবারের দু'সপ্তাহের খাবারও হয় না। (http//time.com/5800930/how-coronavirus-will-hurt-the-poor/)। সাড়ে ৭ লক্ষ আমেরিকানের মাথার উপর কোনও ছাদ নেই। তাদের রাস্তায় ঘুমোতে হয় (ইকনমিক ডেইলি, ১২-০৬-১৯)।

পুঁজিবাদী প্রচারমাধ্যম এবং তাত্ত্বিকরা বারেবারেই একটা তত্ত্ব প্রচার করার চেষ্টা করে থাকেন— শ্রমিকদের দারিদ্রের জন্য আসলে দায়ী শ্রমিকরাই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এমনকি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের নিজস্ব মাপকাঠিগুলো ধরে বিচার করলে এক্ষেত্রে কী দেখতে পাওয়া যায়? আমেরিকার ক্ষেত্রে আসুন আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় বেছে নিয়ে সেই সময়ে উৎপাদন ও বেতনবৃদ্ধির দিকে একবার চোখ রাখি। ১৯৪৮ থেকে '৭৯ আমেরিকায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ১০৮.১ শতাংশ। ঐসময়ে ঘন্টাপিছু বেতনবৃদ্ধি কিন্তু দেখা যাচ্ছে শতাংশের হারে বেশ খানিকটা কম, ৯৩.২ শতাংশ। আর ১৯৭৯ থেকে ২০১৮ সময়সীমায় দেখা যাচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে ৬৯.৬ শতাংশ, বেতনবৃদ্ধি কিন্তু ঐ একই সময় মাত্র ১১.৬ শতাংশ, অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্র ছয়ভাগের একভাগ। এরমধ্যে উচ্চ আয়ের কর্মচারী, যাদের বেতন বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশি তাদের আমরা হিসেব থেকে বাদ দিই, তবে দেখবো বেশিরভাগ শ্রমিক কর্মচারীর বাস্তব বেতন এই দীর্ঘ সময় জুড়ে একটুও বাড়েনি, যদিও উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে ঐ একই সময় পায় ৭০ শতাংশ (http //www.epi.org/productivity-pay-gap/)। তাহলে কী করে বলা চলে তাদের দারিদ্রের জন্য শ্রমিকরা নিজেরাই দায়ী? নাকি বাস্তবটা ঠিক বিপরীত? উৎপাদনবৃদ্ধির প্রায় পুরো সুফলটাই অতি ধনী মালিক শ্রেণির পকেটস্থ হওয়াতেই শ্রমিক কর্মচারীদের এই হতদরিদ্র দশা?

ঋণভিত্তিক অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত

সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের ক্রমহ্রাসমান আয়ের আরেক প্রমাণ তাদের ক্রমাগত ঋণ নির্ভরতা বৃদ্ধি। আমরা জানি, পুঁজিবাদী অর্থনীতির মন্দার কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমে যাওয়া। কারণ তার আয় হ্রাস পাওয়া। এখন পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে অর্থনীতিকে বাঁচানোর উপায় হিসেবে যেসব টোটকা দাওয়াই'এর ব্যবস্থা করেছেন, ধার দেওয়া তার অন্যতম। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সংগঠনের পক্ষ থেকে মানুষকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হয়, যাতে মানুষ বাজার থেকে কিছু কিনতে পারে। আর সেই সুযোগে বাজার কিছুটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কিন্তু এই ঋণভিত্তিক অর্থনীতি যে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি ডেকে আনতে পারে ২০০৮ সালের মন্দা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তারপরেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এখনও সেই পথই অনুসরণ করে চলেছেন।

মার্কিন নাগরিকরা এখন ঋণের দায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাদের ঋণের রকমফের বহু — গৃহঋণ, ক্রেডিট কার্ড বাবদ ঋণ, শিক্ষা বাবদ ঋণ, গাড়ির জন্য নেওয়া ঋণ। দেশের মানুষের নেওয়া মোট ঋণ ২০১৪ সালে যেখানে ছিল ১১.৫ লক্ষ কোটি ডলার, ২০১৯-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ লক্ষ কোটি ডলারে। উচ্চশিক্ষা আমেরিকায় অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তার উপর গত ১৯৮০ থেকে প্রতিবছর এই বাবদ ব্যয়বৃদ্ধি গড়ে ৭ শতাংশের মতো। এর ফলে ছাত্রদের পক্ষে শিক্ষাবাবদ ঋণ নেওয়া ছাড়া পড়াশুনো চালানো প্রায়শই মুশকিল। দেখা যাচ্ছে আমেরিকায় ছাত্রদের নেওয়া এই শিক্ষাঋণের মোট পরিমাণ ২০০৪ সালে যেখানে ছিল ২৬ হাজার কোটি ডলারের কাছাকাছি, ২০১৯'এ গিয়ে তা দাঁড়ায় ১.৫ লক্ষ কোটি ডলারে— মানে ১৫ বছরে এক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ ৭ গুণ। বর্তমানে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মার্কিন নাগরিক এই শিক্ষাঋণের আওতায়। পরিসংখ্যান আরও দেখাচ্ছে— সাধারণ কোনও ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করতে, অর্থাৎ শুধুমাত্র কলেজস্তরের শিক্ষা শেষ করতেই একজন গড়পড়তা মার্কিন নাগরিকের যা ঋণ হয়ে যায়, তা শোধ করতে তার সময় লাগে অন্তত ২১ বছর (কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিস ২০১৯)। এর মানে হল— একজন সাধারণ মার্কিন নাগরিক যদি ২১ বছর বয়সে তার কলেজ শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তাহলেও তার নেওয়া ঋণ শোধ করতে করতে সে মধ্য চল্লিশে এসে পড়ে। আর এর মধ্যে সে যদি কখনও চাকরি হারায়, বা কয়েক মাসও উপার্জনহীন হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়, ঋণদাতারা কি তাকে তখন ছেড়ে দেবে? তাছাড়াও ঐ কয়েক মাস ঋণ শোধ না করতে পারার ফলে সুদের পরিমাণও তো আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে। এখন নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, কেন বহু মার্কিন যুবকযুবতী তার যোগ্যতামানের থেকে অনেক কম বেতনেও কাজ করতে বাধ্য হয়।

১৮ কোটি ৯০ লক্ষ মার্কিন নাগরিকের হাতে আজ ক্রেডিট কার্ড। আর ২০১৯ সালে ক্রেডিট কার্ড বাবদ পরিশোধ্য মোট ঋণের পরিমাণ ১ লক্ষ ৮ হাজার কোটি ডলার। ক্রেডিট কার্ড আছে এমন প্রতিটি পরিবারের ঋণের পরিমাণ ৮৩৯৮ ডলার। যেখানে আমেরিকায় ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে গ্রাহক ঋণ পান খুব জোর বার্ষিক ১ শতাংশ হারে, ক্রেডিট কার্ডের ঋণ বাবদ সেখানে সুদ গুনতে হয় গড়ে বার্ষিক ১৭ শতাংশ হারে। 'ম্যাগনিফাই মানি' সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৮-'১৯ আর্থিক বছরে শুধুমাত্র ক্রেডিট কার্ড বাবদ বিভিন্ন চার্জ শোধ করতে হয়েছে আমেরিকার মানুষকে ১০ হজার ৪০০ কোটি ডলার (http//www.cnbc.com/2018/07/19/consumers-paying-104-billion-in-credit-card-interest-and-fees.html)। এই কারণেই বিভিন্ন ব্যাঙ্ক আজকাল নানা আকর্ষণীয় অফারের মাধ্যমে দিনরাত তাদের গ্রাহকদের ক্রেডিট কার্ড গছাতে চেষ্টা চালায়, যাতে ছাত্রাবস্থা থেকেই সে ক্রেডিট কার্ডে কেনাকাটা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সেই বাবদ সারা জীবন ধরেই তার কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত উপার্জনের এক বড় অংশ ঋণ পরিশোধে ব্যয় করতে বাধ্য হয়, আর সেই সুদের টাকায় ঋণদাতা সংস্থাগুলি ফুলে ফেঁপে উঠতে পারে।

২০০৮ সালে আমেরিকার অর্থনৈতিক মহামন্দার অন্যতম কারণ ছিল লাগামছাড়া গৃহঋণ। তারপরেও, ২০১৮ সালেও দেখা যাচ্ছে সে দেশে এই বাবদ মোট ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি ডলার (http//www.thebalance.com/average-monthly-mortgage-payment4154282)। আমেরিকার মোট জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশই এখনও ভাড়া বাড়িতে বাস করে। কিছু কিছু শহরের ক্ষেত্রে এই হার এমনকি ৭০ শতাংশ। ১৯৮১ সালের হিসেব অনুযায়ী আমেরিকার বাড়ি ক্রেতাদের গড় বয়স ছিল ৩১ বছর। ২০১৯ সালে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭ বছর (http //www.marketwatch.com/story/this-chart-shows-just-how-much-is-staked-against-young-peopke-who-want-to-buy-a-home-2019-12-05)। বাসস্থান হল মানুষের খাদ্য বা বস্ত্রের মতোই একটা মৌলিক চাহিদা। দেখা যাচ্ছে এই মৌলিক চাহিদা মেটাতেই আজ আমেরিকার মানুষকে তাদের রোজগারের মোটা একটা অংশ ক্রমাগত ব্যয় করে যেতে হচ্ছে।

বর্তমান করোনা অতিমারি পর্বের আগেই মার্কিন দেশের অধিকাংশ মানুষই পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের মতে পবিত্র 'সম্পদের অধিকার' থেকে এতটাই বঞ্চিত হয়ে পড়ে যে মালিক শ্রেণির কাছে নিজেদের শ্রম বিক্রি ব্যতীত তাদের জীবনধারণ করাই অসম্ভব। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র পাতায় কার্ল মার্কস লিখেছিলেন— "আমরা যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপের কথা বলি, আপনারা অনেকে আতংকিত হয়ে পড়েন। কিন্তু আপনাদের বর্তমান সমাজে প্রতি দশ জনের নয় জন মানুষের কাছেই তো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইতিমধ্যেই লোপ পেয়ে গেছে;বাকিদের হাতে এর অস্তিত্বর একমাত্র কারণই হল সমাজের এই নয় দশমাংশ মানুষের হাতে এর অস্তিত্বহীনতা। অর্থাৎ আপনারা আমাদের সমালোচনা করছেন সম্পত্তির এমন একটি রূপের বিরোধিতা করার জন্য, সমাজের একাংশের হাতে যার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয় শর্তই হল সমাজের বেশির ভাগ মানুষের হাতে তা না থাকা।" (একাদশ পরিচ্ছদ)

করোনা অতিমারিকালীন পরিস্থিতি

এতক্ষণ ধরে আমরা করোনা পূর্ব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। করোনা পরিস্থিতি এবং তদজনিত লকডাউন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে মাত্র। সাধারণ মার্কিন নাগরিক এবং শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশা এর ফলে এক অভূতপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছেছে। আমেরিকা ইতিমধ্যেই এক প্রবল অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে দিয়ে চলেছে। কিন্তু একমাত্র সরকার তা স্বীকার করছে না। করোনা পর্বের বহু আগে ২০১৯ সালের আগস্ট মাসেই প্রতি চারজনের মধ্যে তিনজন অর্থনীতিবিদই এই বিষয়ে তাঁদের সহমত পোষণ করতেন (ওয়াশিংটন পোস্ট, ০৯-০৮-২০১৯)। বর্তমানে ন্যাশনাল বুরো অব ইকনমিক রিসার্চও তাদের জুন মাসের রিপোর্টে তা সরকারিভাবেভাবে স্বীকার করেছে (সিএনবিসি, ০৯-০৬-২০২০)। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে মার্কিন সরকার ও তাদের পেটোয়া প্রচারমাধ্যম এই অতিমারি পরিস্থিতির ঠিক আগে দাবি জানিয়েছিল— ২০১৯ সাল নাকি মার্কিন শ্রমিকদের পক্ষে খুব ভালো একটা বছর ছিল। কারণ এই বছরে বেকারির হার মাত্র ৩.৫ শতাংশে নেমে এসেছিল। তারা দাবি জানিয়েছিল — এত কম কর্মহীনতা নাকি বাস্তবে কর্মহীনতা আদৌ না থাকার সমান। অথচ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎস সেই সময়েই বলেছিলেন, এবারের মন্দার বৈশিষ্ট্যই হল তার ভয়ংকর গতি। বিশেষভাবে তা কর্মহীনতার ক্ষেত্রে সত্য। বর্তমান মন্দায় মাত্র কয়েক সপ্তাহে কর্মহীনতার মাত্রা ১০ শতাংশ পেরিয়ে গেছে। ১৯৩০'এর মহামন্দার সময়েও কর্মহীনতা কখনও এই মাত্রা ছোঁয়নি (সিএনবিসি, ০৯-০৬-২০২০)। আজকের করোনা পরিস্থিতি যে আমেরিকার শ্রমিক-কর্মচারী-সাধারণ মানুষের জন্য কী ভয়াবহ পরিস্থিতি নামিয়ে এনেছে, বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমের পক্ষেও তা আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিনামূল্যে একটু খাবার পাওয়ার আশায় দেখা গেছে এমনকি এক মাইলের থেকেও লম্বা লাইন। ১১ জুলাই, ২০২০ শেষ হওয়া সপ্তাহে দেখা গেছে ১৩ লক্ষ মানুষ নতুন করে আনএমপ্লয়মেন্ট ইনসিওরেন্স পাওয়ার জন্য নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছে। এই পরিমাণ ২০০৭-'০৯ মন্দার সময়ের তুলনাতেও দ্বিগুণ। এছাড়াও আরও ৯ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে অতিমারিকালীন কর্মহীনতা সংক্রান্ত সাহায্যের জন্য (ব্লুমবার্গ, ২০-০৭-২০২০)। সরকারিভাবেই বলা হচ্ছে — অন্তত ৩ কোটি মানুষ এই সময়ে কাজ হারিয়েছেন। পরিযায়ী শ্রমিক, ঠিকা শ্রমিকদের

আটের পাতায় দেখুন

মার্কিন শ্রমিক শ্রেণির দুরবস্থা

সাতের পাতার পর

ধরলে বাস্তবে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৫ কোটির কাছাকাছি। এর মানে দাঁড়ায় মার্কিন কর্মক্ষম জনসাধারণের এক-তৃতীয়াংশই এখন কর্মহীন (ওয়ার্কারস' ওয়ার্লড, ০৮-০৫-২০২০)। শুধু তাই নয়, অর্ধেক কর্মক্ষম মানুষই যে কোনও মুহূর্তে কাজ হারাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ফলে করোনা পরিস্থিতির ধাক্কায় এক বিরাট সংখ্যক কাজ হারানো মানুষকে ভিখারির মতোই আজ ফুড কুপনের লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। এমনকি এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও বেশ কিছু সংস্থার শ্রমিক, যাদের এমনকি নিজেদের ইউনিয়ন করারও অধিকার নেই - যেমন আমাজন, ইনস্টাকার্ট, টার্গেট, প্রভৃতি সংস্থা— তারা মে দিবসে নিজেদের জন্য নিরাপদ কাজের পরিবেশ এবং অসুস্থতাজনিত ছুটির অধিকারের দাবিতে ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমানে স্বাস্থ্যকর্মীরা, পরিযায়ী কৃষিশ্রমিকরা, মুদিখানার দোকানে কর্মীরা এবং অন্যান্য এধরনের কম আয়ের কর্মীরা নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুর জন্য লড়াই করছে। বোঝাই যাচ্ছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও যেসব কাজ এই সময় চলে গেছে, তার অনেকগুলোই আর ফিরে আসবে না। আর বিশেষত আফ্রিকান-আমেরিকান, হিসপ্যানিক এবং সমাজের এইধরনের দুর্বল অংশ, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই যাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রবল সংগ্রাম করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যাও এদের মধ্যেই অধিক, শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় দ্বিগুণ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪-০৮-২০২০) — এরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। বর্তমানে সরকার পরিস্থিতির চাপে একরকমের বাধ্য হয়েই গত কয়েক দশকের ব্যয়সংকোচনের নীতি থেকে সরে এসে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে আপাতত কয়েক লক্ষ কোটি ডলার ব্যয় করতে এগিয়ে এসেছে। এমার্জেন্সি রিলিফ ফান্ডের নামে এই টাকা দেওয়া হলেও দেখা যাচ্ছে এর বেশিরভাগটাই যাচ্ছে বড় বড় কোম্পানিগুলোরই গর্ভে। বেশিরভাগ কাজ হারানো শ্রমিক কর্মচারী, যাদের এই রিলিফের সবচেয়ে বেশি দরকার, তারা হয় এখনও পর্যন্ত তা পায়নি, অথবা দেখা যাচ্ছে নানা নিয়মের প্যাঁচে পড়ে তা পাওয়ার যোগ্যই না (ওয়ার্কারস' ওয়ার্লড, ০৮-০৫-২০২০)। তার উপর বিশ্বায়ন আমেরিকার মতো উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন আরও কঠিন করে তুলেছে। তাদের এখন প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে পিছিয়ে থাকা নানা দেশের গরিব শ্রমিকদের সঙ্গে, কারণ মালিকশ্রেণি সস্তায় কাজ করিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের উৎপাদন এখন প্রায়শই সেইসব দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের সচেতন বিপ্লবী সংগ্রামই একমাত্র পারে এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার, পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিজস্ব অস্থিরতা এবং শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের শোষণের মাধ্যমে ক্রমাগত সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের ধাক্কাতেই আজ আমেরিকার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ আজ এই দুর্দশার মুখোমুখি। এমনকি তাদের তথাকথিত ভালো দিনেও, যখন সমাজে নাকি কর্মহীনতা বলেই কিছু নেই, তখনও তাদের কম বেতনে সাময়িক ঠিকা কাজ করে দিন কাটাতে হচ্ছে। জীবন তাদের অনিশ্চয়তায় ভরা। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ, এখনও পর্যন্ত যাদের নেতা আমেরিকা, এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকটে আজ হাবুডুবু খাচ্ছে। ১৯৩০'এর মহামন্দার তুলনাতেও তা ভয়াবহ। এই সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া তো দূরস্থান, দিনে দিনে তা আরও উচ্চ মাত্রা অর্জন করবে। কারণ, এর থেকে পরিত্রাণের আশায় যত কাজ ছাঁটাই করা হবে, মানুষ উত্তরোত্তর কম বেতনে অনিয়মিত কাজ করতে বাধ্য হবে। পুঁজিবাদী অতি উৎপাদনের ফলে জমে যাওয়া পণ্য কেনবার মতো ক্রেতাও কমে যাবে। ফলে আরও কারখানা বন্ধ হবে, ছাঁটাইয়ের পরিমাণও আরও বাড়বে। করোনা অতিমারি নিজে যেমন ভয়াবহ, এমনিতেই তীব্র সংকটে ডুবে থাকা বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিকেও অনুঘটক হিসেবে তা আরও গভীরতর সংকটের আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ১৯৩০-এর মহামন্দার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মার্কিন অর্থনীতি সাময়িক অক্সিজেনের জোগান পেয়ে কিছুটা সামলে ওঠে এবং বাকি শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির যুদ্ধেসরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ার নেতৃত্বে উঠে আসে। কিন্তু এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবেই তার অর্থনীতি ধীরে ধীরে পড়ে আসছে। বিশ্বায়ন, একের পর এক নবতর প্রজন্মের প্রাযুক্তিক উন্নতি, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের উপর ক্রমবর্দমান শোষণ ও তাদের জীবনযাত্রার মানের উপর ধারাবাহিক আঘাত— কোনও কিছুই তাকে অর্থনীতির এই পঙ্কিল আবর্ত থেকে উদ্ধারের পথ বাতলাতে পারেনি।

এখন এই ভয়াবহ করোনা আবহে তাদের 'শকুনি প্রবৃত্তি' আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের অসহায়তা ও মৃত্যুকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে উদ্দেশ্য যতটা সম্ভব লাভ করে নেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে চলেছে বিবিধ উপায় অবলম্বন— জীবনদায়ী ওষুধের দাম ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা, করোনা টেস্টের নামে যতটা সম্ভব অতিরিক্ত লাভ করে নেওয়া, বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব তৈরি করে তার দাম আকাশছোঁয়া করে তোলা, বিভিন্ন অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার রাতারাতি মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি; এমনকি সরকার থেকে এই পরিস্থিতিতে যে রিলিফ ফান্ড তৈরি করা হয়েছে, নানা ঘুরপথে তার টাকারও এক বিরাট অংশ শেষপর্যন্ত ঐ কতিপয় অতি ধনীরই হস্তগত হচ্ছে। একদিকে সামান্য কয়েক শত হাতে এসে জমা হওয়া অপরিমেয় সম্পদ, আর অন্যদিকে ক্রমবর্দমান দারিদ্র ও অনিশ্চয়তায় দিশাহারা কোটি কোটি বুভুক্ষু জনতা— আজকের একবিংশ শতকীর বিশ্বায়িত মহাসংকটগ্রস্ত শোষণমূলক সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের এই হল স্বরূপ। আজকের এই কোভিড ১৯ অতিমারিতে আরও তীব্র মহাসংকটে ডুবতে থাকা অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তাই আজ শ্রমিক শ্রেণির আবার দরকার মহান দার্শনিক কার্ল মার্কসের সেই অমোঘ শিক্ষাকে স্মরণ করা— "সর্বহারার শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই। জয় করবার জন্য আছে সারা দুনিয়া।" (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো) ইতিমধ্যেই এই শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের চেহারায় নানাভাবে ফেটে পড়তে শুরু করেছে। আমেরিকাতেও 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলনের সময় এই বিক্ষোভ এখনও পর্যন্ত তার শীর্ষ ছুঁয়েছিল; আজকের 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনও এখনও চলছে। দীর্ঘস্থায়ী এই আন্দোলনের ধাক্কায় পেন্টাগনের কর্তারা এই মুহূর্তে যথেষ্টই বিচলিত। আশা করা যায়, সেই দিন আর খুব দূরে নয়, যেদিন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণির সাথে হাতে হাত মিলিয়ে আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণিও এগিয়ে আসবে লড়াইয়ের পথে, এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে বিপ্লব সংগঠিত করে মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে।

বিজেপি সরকারের কৃষক নিধনকারী কালা আইনের প্রতিবাদে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ

ত্রিপুরা

ছত্তিশগড়

নদিয়া

মেদিনীপুর শহর

নিমতৌড়ি, পূর্ব মেদিনীপুর

বন্দিদের মুক্তির দাবি জানাল এস ইউ সি আই (সি)

কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিতে জেলবন্দিদের মধ্যে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকায় তাঁদের মুক্তির অনুরোধ জানিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর সংশোধনাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠান দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর।

চিঠিতে তিনি বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নির্দেশে সংশোধনাগারগুলি থেকে বন্দিদের কয়েক মাসের জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সময়সীমা শেষ হওয়ার পর তাঁদের আবার সংশোধনাগারে ফিরে যেতে হয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেক অশীতিপর বন্দিও আছেন। কিন্তু দেশে কোভিড সংক্রমণের বর্তমান যে হার এবং বিভিন্ন সংশোধনাগারের যা পরিস্থিতি তাতে এঁদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর সংশোধনাগারে প্রতিদিন কাজে আসা প্রহরীদের ৪ জন আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বন্দিরা কোভিড আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন। অন্য সংশোধনাগারগুলির পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ার কথা নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অনুরোধ করেছেন, বন্দিদের আবার যেন প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয় এবং যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ততদিন তাঁদের বাড়িতে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়।

ভাতা নয় চাকরি চাই
কলকাতার রাজপথে যুবশ্রীদের বিক্ষোভ

২৪ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্টব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতি-র পক্ষ থেকে স্থায়ী কর্মসংস্থানের দাবিতে কলকাতায় শ্রমদপ্তর অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা দুই শতাধিক যুবক-যুবতী এতে অংশগ্রহণ করেন। ধর্মতলা ওয়াই চ্যানেলে সকাল ১১টায় সমবেত হয়ে মিছিল করে তাঁরা বেন্টিংক স্ট্রিটে শ্রমদপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের প্রধান দাবি, ভাতা নয় চাকরি চাই। শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছে তাঁরা স্মারকলিপিও পাঠান।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে যুবশ্রী প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন, প্রতি বছর এই প্রকল্পে যুবকদের স্থায়ী চাকরিতে নিয়োগ করা হবে। যদিও গত সাত বছরে এই প্রকল্প থেকে কারওরই কর্মসংস্থান হয়নি। এমনকি ভাতাও বন্ধ হয়ে গেছে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক প্রণয় সাহা জানান, বেকার যুবকদের দুঃসহ সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা না হলে আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন।

জাতীয় সড়কে রানওয়ের প্রতিবাদ নারায়ণগড়ে

নারায়ণগড় ব্লকের পোক্তাপুল থেকে শ্যামপুরা পর্যন্ত এন এইচ-৬০ রাস্তার উপর বায়ুসেনার বিমান অবতরণের যে প্রক্রিয়া চলছে তার প্রতিবাদ জানিয়ে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডিএম-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এডিএম (জেনারেল) ডেপুটেশন নেন। তিনি বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, এরকম কোনও নির্দেশ নেই বলে জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা সম্পাদক কমরেড নারায়ণ অধিকারী বলেন, 'জেলার ব্যস্ততম জাতীয় সড়কের উপর এতবড় একটা কর্মকাণ্ড জেলা প্রশাসনের অজ্ঞাতসারে চলছে, এটা ছেলেভোলানো কথা। আসলে প্রশাসন চালাকির আশ্রয় নিচ্ছে। মাত্র ২৫ কিমির মধ্যে কলাইকুণ্ডাতে বায়ুসেনার বিশাল বিমানঘাঁটি থাকা সত্ত্বেও আরেকটি নতুন রানওয়ে নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমরা মনে করি না।' তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, অদূর ভবিষ্যতে উক্ত রানওয়ে বিস্তৃত হয়ে বিমানঘাঁটি তৈরি হবে এবং ওই এলাকার স্কুল, বাজার, চাষের জমি সহ অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকা নষ্ট হবে। তিনি বলেন, যদি বায়ুসেনার ঘাঁটি করতেই হয় তাহলে জনহীন এবং ঊষর স্থানে করা হোক। জনগণকে অন্ধকারে রেখে এই ধরনের গোপন অভিসন্ধিমূলক কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, না হলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই এলাকায় বিক্ষোভ, অবরোধ সংগঠিত হয়েছে। এন এইচ-৬০ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে দলের পক্ষ থেকে।

রেল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ প্রতিরোধে আন্দোলনের নাগরিক মঞ্চ গঠিত

রেল, প্রতিরক্ষা সহ অন্যান্য সরকারি বিভাগ এবং ব্যাঙ্ক, বিমা, বিদ্যুৎ, তৈলক্ষেত্র, কয়লা ইত্যাদি

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শিল্পগুলি বেসরকারিকরণ, মূল্যবৃদ্ধিসহ সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ২২ সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে রেলের কর্মী সংগঠন, হকার সংগঠন, পরিচারিকা সংগঠন, যাত্রী সমিতি সহ কয়েকটি নাগরিক সংগঠনের উদ্যোগে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ, চিকিৎসক নেতা ডাঃ তরুণ মণ্ডল, গণআন্দোলনের নেতা চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, শ্রমিক নেতা অশোক দাস, নন্দ পাত্র, ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস ইউনিয়নের নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখার্জী প্রমুখ। এই বেসরকারিকরণের নীতি কীভাবে শ্রমিক ও জনগণের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবে বক্তারা তা তুলে ধরেন। বিজেপি সরকারের বেসরকারিকরণের নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত নাগরিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে ডাঃ তরুণ মণ্ডলকে কনভেনর করে একটি বেসরকারিকরণ বিরোধী নাগরিক মঞ্চ গঠিত হয়। কনভেনশন থেকে এক প্রতিনিধি দল শিয়ালদহ ডিআরএম-এর কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। ২৫ সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ভারত বনধের সমর্থনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লিগাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে আইনজীবী কাশীকান্ত মৈত্র স্মরণে সভা

লিগাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে ১২ সেপ্টেম্বর ফেসবুক ও ইউটিউবে হাইকোর্টের প্রখ্যাত বরিষ্ঠ আইনজীবী কাশীকান্ত মৈত্রের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠান হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি, রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রখ্যাত ব্যারিস্টার বিমল কুমার চট্টোপাধ্যায় ও হাইকোর্টের প্রখ্যাত বরিষ্ঠ আইনজীবী প্রতীক ধর। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন সংগঠনের সভাপতি, সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত। বার্তাগুলি পড়ার পর সংগঠনের সম্পাদক হাইকোর্টের আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী বক্তব্য রাখেন। সভার মূল বক্তা এবং হাইকোর্টের প্রখ্যাত বরিষ্ঠ আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত কাশীকান্ত মৈত্রের বর্ণময় ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। রাজ্যের প্রায় সমস্ত কোর্টের প্রাক্তন ও বর্তমান বিচারপতি, বরিষ্ঠ আইনজীবী, ল-ক্লার্ক, ল-স্টুডেন্ট সহ বহু শতাধিক মানুষ এই অনুষ্ঠান শোনেন এবং উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

মদ নিষিদ্ধের দাবিতে মহিলা ও ছাত্র মিছিল

রাজ্য সরকারের মদ বিক্রি বাড়ানোর নীতির বিরুদ্ধে এবং মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে মিছিলে সামিল হলেন উত্তর দিনাজপুরের ছাত্র ও মহিলারা। ২২ সেপ্টেম্বর রায়গঞ্জের অফিস পাড়া কর্ণজোড়া এলাকায় মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস এবং ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র ডাকে মিছিলে সামিল হন বহু ছাত্র-ছাত্রী এবং মহিলা মিছিল জোলাশাসকের দপ্তরের সামনে গেলে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্যামল দত্ত এবং শুক্লা বর্মণের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়। আবগারি দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়ে মদ বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর জন্য 'হয় পুরস্কার না হলে শাস্তি'র নীতির তীব্র বিরোধিতা করা হয়। আবগারি দপ্তরের এই নির্দেশনামা প্রত্যাহারের দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

ত্রিপুরায় শিক্ষকদের উপর বর্বর পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা

২৩ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরায় আন্দোলনকারী শিক্ষকদের উপর বর্বর হামলা চালাল সেখানকার বিজেপি সরকারের পুলিশ।

২০০৯ সালে আইনের বিধি অগ্রাহ্য করে ১০ হাজার ৩২৩ জন শিক্ষক নিয়োগ করেছিল তৎকালীন সিপিএম সরকার। পরে এ নিয়ে মামলা হয় এবং আদালতের রায়ে ২০২০ সালে ওই শিক্ষকদের কাজ চলে যায়। ২০১৮-তে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি এবং সিপিএম— উভয় দলই এঁদের বিকল্প চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অথচ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় বসার আড়াই বছর পার হতে চললেও এঁদের কাজের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে চাকরির দাবিতে শিক্ষকরা ২৩ সেপ্টেম্বর মহাকরণ অভিযান করলে পুলিশ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁদের উপর বর্বর হামলা চালায়। এমনকি জামিন অযোগ্য ধারায় মামলাও দায়ের করে। বহু আন্দোলনকারী শিক্ষক সেদিন গুরুতর আহত হন। বিজেপি সরকারের এই বর্বর ও অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র নিন্দা করেছে এস ইউ সি আই (সি)-র ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি এবং অবিলম্বে এফআইআর তুলে নিয়ে বিকল্প চাকরির ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছে।

শহিদ ই আজম ভগৎ সিং স্মরণে

২৮ সেপ্টেম্বর শহিদ ই আজম ভগৎ সিং-এর ১১৪তম জন্ম দিবস। সারা দেশের সাথে দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা পার্কে ভগৎ সিং মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এআইডিওয়াইও নেতৃবৃন্দ। দিনটি বেকারি বিরোধী দিবস হিসাবে সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশ জুড়ে পালিত হয়।

চিকিৎসার নিদান দেবেন এবার মন্ত্রী-আমলারা

কালা দিবস পালন চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের

২৫ সেপ্টেম্বরকে কালা দিবস ঘোষণা করে কালো ব্যাজ ধারণ করে কাজ করলেন সারা দেশের চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা। ২৪ সেপ্টেম্বর এক গেজেট নোটিফিকেশনের জোরে কলমের এক খোঁচায় ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে মেডিকেল শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে নিয়ামক সংস্থা কাজ করে চলছিল তাকে ভেঙে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। এর ফলে সমস্ত রাজ্যের চিকিৎসক, মেডিকেল শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বদলে ডাক্তারি শিক্ষা, গবেষণা, চিকিৎসার নিয়ন্ত্রণ চলে গেল সরকারি অফিসার ও মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের হাতে। চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা যখন জীবন বাজি রেখে কোভিড-১৯ মহামারি রোধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন, ঠিক সেই সময় তাঁদের উপর এই আক্রমণ নামিয়ে আনল বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার।

আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে দেশের অধিকাংশ চিকিৎসক, মেডিকেল শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ছাত্ররা ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের নামে কর্পোরেটমুখী চিকিৎসা ও ডাক্তারি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। তাঁদের আশঙ্কা, এর ফলে মেডিকেল শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা পুরোপুরি দেশি-বিদেশি পুঁজি-মালিকদের কুক্ষিগত হবে। এই ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন আইন শুধু চিকিৎসাবিরোধী নয়, পুরোপুরি জনবিরোধী। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা এই জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সমস্ত চিকিৎসক, ডাক্তারি ছাত্র, গবেষক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

এআইডিএসও-র পক্ষ থেকেও ২৫ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে এর তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, এর ফলে ছাত্রদের জন্য আকাশছোঁয়া ফি-বৃদ্ধি ঘটবে, মেডিকেল শিক্ষা এবং চিকিৎসা পুরোপুরি বেসরকারি পুঁজি-মালিকদের কুক্ষিগত হবে। এর বিরুদ্ধে এবং সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিয়েছে এআইডিএসও।

ক্ষতিপূরণের দাবিতে মুজফফরপুরে ধরনা

বিহারের মুজফফরপুরে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বহু এলাকা প্লাবিত। কৃষি নির্ভর সাধারণ মানুষের জমিতে বন্যার জল ঢুকে পড়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সারা বছর কীভাবে দিন যাপন করবেন এই চিন্তায় দিশেহারা তাঁরা। বহু কৃষক ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করেছেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ শতাধিক কৃষক ২১ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে মুজফফরপুরে ধরনায় বসেন। অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সরকার না করলে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানান।

কর্ণাটকে আশাকর্মীদের মিছিল

আশাকর্মীদের বেতন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পূরণ করছে না কর্ণাটকের বিজেপি সরকার। প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবিতে ২২ সেপ্টেম্বর আশাকর্মী ইউনিয়নের ব্লক স্তরের নেতৃত্বকারী সদস্যদের নিয়ে মিছিলের ডাক দিয়েছিল ইউনিয়ন। অন্তত দশটি জায়গায় মিছিলে আসা কর্মীদের পুলিশ আটকায়, ছিল সরকারি আধিকারিকদের চোখ রাঙানি, এ সত্ত্বেও শত শত আশাকর্মী ব্যাঙ্গালোরের মিছিলে যোগ দেন। আশাকর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক নাগলক্ষ্মী, এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি কমরেড সোমশেখর, সম্পাদক কমরেড এস ইয়াদগিরি এবং এস ইউ সি আই (সি)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে উমা বক্তব্য রাখেন।

শহিদ প্রীতিলতা স্মরণ

২৪ সেপ্টেম্বর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ৮৯তম শহিদ দিবস। এ আই এম এস এস, এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে ত্রিপুরার আগরতলায় কর্নেল চৌমুহনীতে শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাজ্যে রাজ্যে সর্বত্র এই দিনটি পালিত হয়

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com